মাজমুউল ফাতাওয়া

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ

(নির্বাচিত অংশ)

পরকালীন জীবন

এবং অদৃশ্য জগতের ঘটনাবলি

সংকলন ও ব্যাখ্যা:

শায়খ সালিহ আল-ফাওজান

আইএসবিএন (ISBN): ৯৭৮-১-৭৯২৩-০৯০২-১

প্রথম সংস্করণ: শাবান ১৪৪০ হিজরি / এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: Usul Design
ই-মেইল: info@usuldesign.com

অনুবাদক (ইংরেজি): রাশিদ বারবি
অনুবাদ (বাংলা): Gemini
সম্পাদনা ও বিন্যাস: রাজান গ্রেগরি
Annurediting.com

প্রকাশকের তথ্য:
অথেন্টিক স্টেটমেন্টস পাবলিশিং
পি. ও. বক্স ১৫৫৩৬
ফিলাডেলফিয়া, পিএ ১৯১৩১
ফোন: ২১৫.৩৮২.৩৩৮২ | ফ্যাক্স: ২১৫.৩৮২.৩৭৮২

শোরুম:
৫০০০ লোকাস্ট স্ট্রিট (পার্শ্ব প্রবেশপথ), ফিলাডেলফিয়া, পিএ ১৯১৩৯

ওয়েবসাইট: www.authenticstatements.com

ই-মেইল: info@authenticstatements.com

(ইনশাআল্লাহ, আমাদের আসন্ন প্রকাশনা, অডিও/ডিভিডি অনলাইন ক্যাটালগ এবং বিভিন্ন সেমিনার ও অনুষ্ঠানের তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।)

সূচিপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর **'মাজমুউল ফাতাওয়া'** একটি বিশাল ও অত্যন্ত উপকারী প্রবন্ধ সংকলন, যা শায়খ আব্দুর রহমান কাসিম (রহ.) সংকলন করেছেন। শায়খ সালিহ আল-ফাওজান (হাফিজাহুল্লাহ) এই 'মাজমুউল ফাতাওয়া' থেকে আকিদাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো নির্বাচন করে একটি সংকলন তৈরি করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, **'রাডিয়্যান্ট' লাইট ফ্রম ফাতাওয়া অফ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ইন আকিদাহ'** (আকিদাহর বিষয়ে শায়খুল ইসলামের ফাতাওয়া থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা)। তিনি এই রিসালা বা প্রবন্ধগুলোকে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন এবং নিজস্ব ব্যাখ্যা (commentary) যুক্ত করেছেন। এই নির্বাচনে মৃত্যু, পরকাল এবং অদৃশ্যের (গাইব) বিষয়াবলী সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো স্থান পেয়েছে।

বিদ্বানদের নিকট 'মাজমুউল ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ' অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশকৃত একটি গ্রন্থ। শায়খ উসাইমিন (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের 'মাজমুউল ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ' সংগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছি।" শায়খ রাবি'আ বলেছেন: "আমি তোমাদের শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যিমের বইগুলো পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি, বিশেষ করে 'মাজমুউল ফাতাওয়া'।"

আমরা আল্লাহ -এর কাছে প্রার্থনা করি যেন এই বইটির মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রভূত কল্যাণ দান করেন। এবং আমরা তাঁর নিকট আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কাজটিকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, শায়খ আব্দুর রহমান কাসিম, শায়খ সালিহ ফাওজান এবং যারা এটি পড়বেন— সকলের নেক আমলের পাল্লায় যুক্ত করে দেন।

রশিদ বারবি
ডারহাম, নর্থ ক্যারোলাইনা

‘মাজমুউল ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ’ একটি বিশাল এবং অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের সংকলন, যা আলেম সমাজের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত।

এই নির্বাচিত সংকলনটিতে **শায়খ সালিহ ফাওজানের** ব্যাখ্যা বা ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং পরকাল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: মৃত্যুর সময়ের ফিতনা; কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা ও কবরের আযাব; কবরে দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক; কাফিরদের কবর জিয়ারত করার বিধান; নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিতামাতা প্রসঙ্গ; কবরে শিশুদের পরীক্ষা; পরকালে অমুসলিমদের শিশুদের পরিণতি; কবরে নবীদের অবস্থা; যেসব মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের অবস্থা; কিয়ামত দিবসে কাফিরদের অবস্থা এবং কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ ঘটনাবলি ও আরও অনেক কিছু!

“আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ সংগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছি।” (শায়খ উসাইমিন)

শায়খ ফাওজান-এর পরিচিতি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ ﷻ -এর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই সত্তার ওপর, যাঁর পরে আর কোনো নবী নেই; অর্থাৎ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর। অতঃপর:

প্রকৃতপক্ষে, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর **'মাজমুউল ফাতাওয়া'** ইসলামি জ্ঞানের একটি বিশাল প্রামাণ্য রেফারেন্স এবং এক সুবিশাল ভাণ্ডার। এতে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ফিকহ বা গভীর জ্ঞান সংকলিত হয়েছে সালাফে সালেহীন বা পুণ্যবান পূর্বসূরিদের সঠিক বুঝ অনুযায়ী, যা শরীয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগ্রত করেছেন। শিরক, বিদআত, কুসংস্কার এবং অন্ধ তাকলীদের স্তূপের নিচে পড়ে থাকা এই উম্মাহকে তিনি এর মাধ্যমেই পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই আল্লাহ উম্মাহকে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন, যখন পশ্চিমা মতাদর্শের স্রোত, দার্শনিকদের বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি এবং সূফীদের মনগড়া কাহিনী উম্মাহর ওপর জেঁকে বসেছিল।

কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর বা জ্যোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই চান না, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। হাদিসে[১] বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি একশ বছরের মাথায় এই দ্বীনের সংস্কার করার জন্য মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠান। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ সেই সংস্কারকদেরই একজন। এটি কোনো আকস্মিক মন্তব্য বা অতিরঞ্জিত প্রশংসা নয়; বরং তাঁর বইগুলোর মাধ্যমেই এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর সেই বইগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এই 'মাজমুউল ফাতাওয়া'।

আমি এই গ্রন্থ থেকে আকিদাহ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলাদা করে সংকলিত করেছি, যেন পাঠক ফাতাওয়া-র মূল সংকলনটির দিকে ফিরে যেতে এবং সেখান থেকে জ্ঞান

---

[১] **অনুবাদকের নোট:** "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর শুরুতে এমন একজনকে পাঠাবেন, যিনি তাদের দ্বীনকে (ধর্মীয় জ্ঞান ও বুঝ) সংস্কার করবেন।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯১; আলবানী একে 'আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ্' ৫৯৯-এ সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।)

আহরণে উৎসাহিত হয়। যেমনটি প্রবাদে বলা হয়: **“যে ব্যক্তি বিশাল সমুদ্রের পানি পান করেছে, সে ছোট খাল বা নালাকে তুচ্ছই মনে করবে।”**

যে ব্যক্তি পূর্ণতা পেতে চায় এবং নিজের উপকারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন মূল উৎসের (মাজমুউল ফাতাওয়া) দিকে ফিরে যায়; কারণ এটি সেই বিশাল সংকলনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যেমনটি বলা হয়ে থাকে:

كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْبِ الْفَرَإِ

“প্রতিটি শিকারই যেন বুনো গাধার পেটে।”[২]

আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন প্রত্যেককে উপকারী জ্ঞান (ইলমে নাফে) অর্জন এবং নেক আমল করার তাওফিক দান করেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীবর্গের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

— **সালিহ ফাওজান**, ১৪২২ হিজরি।

---

[২] **অনুবাদকের নোট:** এটি একটি আরব্য প্রবাদ, যার মূল কথা হলো— সবকিছু একটিমাত্র উৎসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কারণ আরবরা যত ধরণের পশু শিকার করত, সেগুলোর মধ্যে ‘বুনো গাধা’ ছিল সবচেয়ে মূল্যবান; অর্থাৎ অন্য সব শিকারের গুরুত্ব এর তুলনায় কম ছিল।

মৃত্যুকালীন ফিতনাহ

শায়খ ফাওজান: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মৃত্যুর সময় শয়তান কি মানুষের সামনে তার আত্মীয়-স্বজনের বেশ ধরে আসে এবং তাকে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে? আর এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর এই বক্তব্যের অর্থ কী:

إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ

"...নিশ্চয়ই তোমাদের কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে।"[৩]

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। মৃত্যুর সময় মানুষের সামনে বিভিন্ন ধর্ম উপস্থাপন করার যে বিষয়টি, এটি এমন কোনো সাধারণ বিষয় নয় যা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটবে; আবার এটি এমন কিছুও নয় যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একেবারেই অস্বীকার করা যায়। বরং, কিছু মানুষ তাদের মৃত্যুর সময় এই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, আবার অনেকে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। এই সবকিছুই হচ্ছে 'জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ' বা পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে আমাদের সালাতের (নামাজের) শেষে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) তাশাহহুদ পাঠ করবে, তখন সে যেন চারটি (ফিতনাহ) থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এই বলে: **'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'**"[৪]

---

[৩] সুনান আন-নাসাঈ, ২০৬৫।

[৪] সহীহ মুসলিম, ৫৮৮।

মৃত্যুর সময়ে শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করার জন্য অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেষ্ট থাকে; কারণ এই সময়ে মানুষ অত্যন্ত অসহায় ও সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি সহীহ হাদিসে বলেছেন:

الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا

"নিশ্চয়ই মানুষের আমল বা কর্মের বিচার করা হয় তার শেষ পরিণতির ওপর ভিত্তি করে।"[৫]

এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

"একজন ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মতো আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত (বা এক বিঘত) ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে; এমন সময় তার তাকদীর বা লিখন তার ওপর প্রবল হয় এবং সে জাহান্নামবাসীদের মতো কাজ করে বসে, ফলে সে তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করে। আবার অন্য একজন ব্যক্তি জাহান্নামবাসীদের মতো আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে; এমন সময় তার তাকদীর তার ওপর প্রবল হয় এবং সে জান্নাতবাসীদের মতো আমল করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।"[৬]

বর্ণিত আছে যে, আদম সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য শয়তান মৃত্যুর সময়ের চেয়ে বেশি উদগ্রীব আর কখনো থাকে না। সে তার সহযোগীদের বলে, **"এই লোকটিকে ধরো; কারণ সে যদি এখন তোমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়, তবে তোমরা তাকে আর কখনোই পরাস্ত করতে পারবে না।"**

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, "যখন আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তাঁর চিবুক বাঁধার জন্য আমার হাতে এক টুকরো

---

[৫] সহীহ আল-বুখারী, ৬৪৯৩।

[৬] সহীহ আল-বুখারী, ৩২০৮ এবং সহীহ মুসলিম, ২৬৪৩।

কাপড় ছিল। তিনি ঘামছিলেন এবং বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। যখনই তাঁর জ্ঞান ফিরছিল, তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বলছিলেন: **‘এখনো নয়, এখনো নয়।’** তিনি বেশ কয়েকবার এমনটি করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আব্বাজান! আপনি কী বলছেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, **‘শয়তান আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের আঙুল কামড়াচ্ছে আর বলছে, “হে আহমাদ! তুমি আমার হাত থেকে বেঁচে গেলে,” আর আমি তাকে বলছি, “এখনো নয়, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হচ্ছে (ততক্ষণ আমি শঙ্কামুক্ত নই)।”** এই বর্ণনাটি অত্যন্ত সুপরিচিত।

এই কারণেই আশঙ্কা করা হয় যে, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ পালন করেনি, মৃত্যুর সময় তার সামনে খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদি ধর্ম উপস্থাপন করা হতে পারে। এটি আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحُج : فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

“যার কাছে আল্লাহর পবিত্র ঘর (কাবা) পর্যন্ত পৌঁছানোর মতো পাথেয় এবং বাহন রয়েছে, অথচ সে হজ পালন করল না— তবে সে চাইলে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা চাইলে খ্রিস্টান হয়ে।”[৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَیۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَیۡهِ سَبِیۡلًا ؕ وَ مَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الۡعٰلَمِیۡنَ

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।”[৮]

ইকরিমা (রহ.) বলেন, “যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো:

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡهُ ۚ وَ هُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ

[৭] তিরমিযী, ৮১২। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এই হাদিসটিকে সহীহ (অথবা হাসান) হিসেবে গণ্য করেছেন।

[৮] সূরা আলে-ইমরান, ৩:৯৭।

“যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।”[৯]

যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো (যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে তা কবুল করা হবে না), তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দাবি করল, ‘আমরাও তো মুসলিম।’ তখন আল্লাহ তাদের (দাবির সত্যতা পরীক্ষার জন্য) বললেন: **‘মানুষের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে, তাদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওই ঘরের (কাবা) হজ করা আবশ্যক।’** তখন তারা বলল, ‘আমরা হজ করব না।’ ফলে আল্লাহ তাআলা (তাদের অবাধ্যতার প্রেক্ষিতে) অবতীর্ণ করলেন: **‘আর যে ব্যক্তি কুফরী (অস্বীকার) করবে, তবে জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।’“**

আর কবরের ফিতনাহ বা পরীক্ষা হলো—মৃত ব্যক্তিকে যখন দুই ফেরেশতা প্রশ্ন করবেন, তখন এটি তার জন্য একটি পরীক্ষা হবে। তাঁরা তাকে বলবেন, **“তোমার রব কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কী? আর যে ব্যক্তিকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে?”**

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় বাণীর (কালিমা) মাধ্যমে অবিচল রাখেন।[১০] মুমিন ব্যক্তি বলবে, **“আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নবী।”** একইভাবে সে বলবে, **“তিনি মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসুল; যিনি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন; তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করেছি।”**

তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ধমক দেবেন (তার দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য)। এটিই মুমিনের শেষ পরীক্ষা। তাঁরা তাকে প্রথমবারের মতো আবারও একই প্রশ্নগুলো করবেন।

কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। নবীগণ ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক (শরীয়তের বিধান পালনের যোগ্য) প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই

---

[৯] সূরা আলে-ইমরান, ৩:৮৫।

[১০] সূরা ইব্রাহীম, ১৪:২৭।

পরীক্ষা কার্যকর হবে। তবে শিশু এবং অপ্রকৃতিস্থ (পাগল) ব্যক্তিদের কবরে পরীক্ষা করা হবে কি না, এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

- **প্রথম মত:** কিছু আলেম বলেন, তাদের পরীক্ষা করা হবে না। কারণ পরীক্ষা কেবল তাদের জন্যই যারা শরীয়তের বিধান পালনের যোগ্য ছিল। এটি **আল-কাজী** এবং **ইবনে আকীল**-এর মত। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, নাবালক শিশু এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর (কবরে) কালিমা তালকীন করা হয় না।[১১]

- **দ্বিতীয় মত:** অন্য কিছু আলেম বলেন, তাদের কালিমা তালকীন করা হবে এবং কবরে তাদের পরীক্ষাও করা হবে। এটি **আবু হাকিম** এবং **আবুল হাসান**-এর মত।

- **তৃতীয় মত:** আবার কিছু আলেম বলেন, এই দলটিকে কিয়ামতের ময়দানে পরীক্ষা করা হবে। এটিই **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের** অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

---

[১১] **অনুবাদকের নোট:** শায়খ বিন বাজ (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, দমরাহ ইবনে হাবিব নামক একজন তাবিঈ থেকে আবু উমামাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে—মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট...' ইত্যাদি বলতে বলা (তালকীন করা) মুস্তাহাব। কিন্তু এই হাদিসটি নবী (সা.) থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তাই এই আমলটি সঠিক নয়; বরং মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার তালকীন করতে হবে, যাতে এটিই তার শেষ কথা হয়।

মৃত্যু ও নিদ্রার সাদৃশ্য

শায়খ ফাওজান: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে কবরে মৃত ব্যক্তির প্রতি মুনকার ও নাকির[১২] ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রূহ বা আত্মা কি পুনরায় শরীরে ফিরে আসে? আর এর জন্য কি ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করতে হয়?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কবরে থাকা অবস্থায় আত্মা যখন শরীরে ফিরে আসে, তখন তা এই দুনিয়ার জীবনে আত্মা ফিরে আসার মতো নয়; যদিও কিছু দিক থেকে এটি (কবরের জীবন) আরও বেশি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। বরং প্রতিটি জগতের—এই দুনিয়ার জীবন, বারযাখ (দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী জগত) এবং পরকাল—প্রত্যেকটির নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন যে, মুমিনের কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে; যদিও তার ওপরের মাটি অপরিবর্তিতই থাকে।

আত্মা মৃত ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে এবং পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়। একে কি 'মৃত্যু' বলা হবে? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। একটি মত হলো— একে মৃত্যু বলা হয়। যারা এই মত পোষণ করেন, তারা আল্লাহ তাআলার (কুরআনের) বাণীর ব্যাখ্যা থেকে এটি গ্রহণ করেছেন:

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

"তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের দুবার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দুবার জীবন দান করেছেন'।"[১৩]

বলা হয়ে থাকে যে, প্রথম জীবন হলো এই পার্থিব জগত, আর দ্বিতীয় জীবন হলো কবরের জীবন; এবং দ্বিতীয় মৃত্যুটি ঘটে কবরের ভেতরেই। কিন্তু (ইবনে তাইমিয়্যাহর মতে) সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো— এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর অনুরূপ:

---

[১২] মুনকার ও নাকির সংক্রান্ত হাদিসটি ইমাম তিরমিযী সংগ্রহ করেছেন এবং একে 'হাসান' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইবনে হিব্বান একে 'সহীহ' বলেছেন।

[১৩] সূরা গাফির, ৪০:১১।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তোমরা কীভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী (অস্বীকার) করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন (মৃত), অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন; পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন এবং এরপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"[১৪]

প্রথম মৃত্যুটি ছিল এই পার্থিব জীবনের পূর্বে (যখন তোমরা অস্তিত্বহীন ছিলে), আর দ্বিতীয় মৃত্যুটি ঘটে এই পার্থিব জীবনের পরে (দুনিয়ার আয়ু শেষে)। মহান আল্লাহর বাণী— **"পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন"**— এর অর্থ হলো মৃত্যুর পরে (পুনরুত্থান)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

"আমি এই মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং এ থেকেই পুনরায় তোমাদের বের করে আনব।"[১৫]

এবং তিনি আরও বলেন:

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তিনি বললেন, 'সেখানেই (পৃথিবীতে) তোমরা জীবন অতিবাহিত করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে'।"[১৬]

আত্মা বা রূহ যখনই আল্লাহ চান তখনই শরীরের সাথে সংযুক্ত হয়, আবার যখন আল্লাহ চান তখনই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এটি কেবল এক বা দুইবার হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। **'নিদ্রা হলো মৃত্যুর সহোদর' (বোন)।** এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন:

---

[১৪] সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮।

[১৫] সূরা ত্বহা, ২০:৫৫।

[১৬] সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৫।

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

"হে আল্লাহ! আপনারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং জীবিত হই (জাগি)।"[১৭]

এবং যখন তিনি জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন; আর তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"[১৮]

তিনি (রাসুলুল্লাহ সা.) ঘুমের অবস্থাকে 'মৃত্যু' এবং জাগ্রত অবস্থাকে 'জীবন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الۡاَنۡفُسَ حِيۡنَ مَوۡتِهَا وَ الَّتِیۡ لَمۡ تَمُتۡ فِیۡ مَنَامِهَا ۚ فَيُمۡسِكُ الَّتِیۡ قَضٰى عَلَيۡهَا الۡمَوۡتَ وَ يُرۡسِلُ الۡاُخۡرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى

"আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন মানুষের মৃত্যুর সময়, আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণ হরণ করেন ঘুমের সময়। অতঃপর যার জন্য তিনি মৃত্যু বরাদ্দ করেছেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং বাকিগুলো (ঘুমন্তদের প্রাণ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন।"[১৯]

এই আয়াতে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, প্রাণ হরণ বা গ্রহণ করা দুই ধরণের: একটি হলো মৃত্যুর সময় প্রাণ গ্রহণ, আর অন্যটি হলো—যারা এখনও মারা যায়নি—তাদের ঘুমের সময় প্রাণ গ্রহণ। যখন কোনো ব্যক্তি ঘুমাতে যায়, তখন যারা ঘুমের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাদের প্রাণ রেখে দেন, আর যারা মারা যায় না তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিছানায় যাওয়ার সময় বলতেন:

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

[১৭] সহীহ আল-বুখারী, ৬৩২৪।

[১৮] সহীহ আল-বুখারী, ৭৩৯৪।

[১৯] সূরা আয-জুমার, ৩৯:৪২।

"হে আমার রব! আপনারই নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ শায়িত করলাম (শুলাম) এবং আপনারই নামে আমি পুনরায় জাগ্রত হব। যদি আপনি (ঘুমের মধ্যে) আমার প্রাণ কেড়ে নেন, তবে তার ওপর রহম করুন; আর যদি তা ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে সেভাবেই হিফাজত করুন যেভাবে আপনি আপনার নেককার বান্দাদের হিফাজত করেন।"[২০]

একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে আনন্দ এবং বেদনা উভয়ই অনুভব করে। এটি তার আত্মা ও শরীর—উভয়ই অনুভব করে; এমনকি সে যদি স্বপ্নে দেখে যে কেউ তাকে আঘাত করছে, তবে সে শরীরে ব্যথা নিয়েই জেগে ওঠে। আবার সে যদি স্বপ্নে দেখে যে সে ভালো কোনো খাবার খাচ্ছে, তবে সে মুখে সেই খাবারের স্বাদ নিয়েই জাগ্রত হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তি তার স্বপ্নের মধ্যে সুখ এবং শাস্তি—উভয়ই ভোগ করে। সে নিজে এটি অনুভব করলেও তার পাশে শুয়ে থাকা ব্যক্তিটি টেরই পায় না সে কী অনুভব করছে।

ঘুমন্ত ব্যক্তি তার বেদনা বা ভয়ের কারণে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠতে পারে এবং জাগ্রত ব্যক্তিরা তার সেই চিৎকার শুনতে পায়। সে ঘুমের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে, দোয়া পড়তে পারে বা কথা বলতে পারে; আর জাগ্রত ব্যক্তিরা তা শুনতে পায়।

এই সবকিছুই ঘটে যখন ঘুমন্ত ব্যক্তির চোখ বন্ধ থাকে; কেউ তাকে ডাকলে সে শুনতে পায় না। তাহলে কবরের অবস্থাকে কীভাবে অস্বীকার করা সম্ভব, যেখানে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন যে—মৃত ব্যক্তি (দাফন করে ফিরে যাওয়া লোকদের) জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়? এবং তিনি (কাফিরদের লাশের উদ্দেশে কথা বলার সময়) বলেছিলেন, **"আমি যা বলছি, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছ না (অর্থাৎ তারাও সমানভাবে শুনতে পাচ্ছে)।"**

অন্তর বা হৃদয়ের সাথে কবরের এক ধরণের সাদৃশ্য রয়েছে। এই কারণেই খন্দকের যুদ্ধের সময়—যখন মুশরিকরা মুসলিমদের ব্যস্ত রাখার ফলে তাঁদের আসরের সালাত কাজা হয়ে গিয়েছিল—তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন:

مَلَأَ اللهُ قُلُوبَهِم وَقُبُورَهُمْ نَارًا

---

[২০] সহীহ আল-বুখারী, ৬৩২০ এবং সহীহ মুসলিম, ২৭১৪।

“আল্লাহ তাদের অন্তর এবং তাদের কবরসমূহ আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দিন!”[২১]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে এই দুটির (অন্তর ও কবর) মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন:

اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِی الۡقُبُوۡرِ. وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوۡرِ.

“তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে, আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?”[২২]

এটি অন্তর ও কবরের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করে; তবে মৃত ব্যক্তি যে সুখ বা শাস্তি ভোগ করে, তাকে হুবহু ঘুমন্ত ব্যক্তির সুখ বা শাস্তির মতো বলা বৈধ হবে না। কবরের সুখ ও শাস্তি (ঘুমের তুলনায়) অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ এবং অনেক বেশি তীব্র। এটি সম্পূর্ণ বাস্তব ও সত্য সুখ এবং বাস্তব ও সত্য শাস্তি। ঘুম এবং কবরের মধ্যকার এই উদাহরণটি কেবল একারণেই দেওয়া হয়েছে যাতে এটি যে সম্ভব—তা প্রমাণ করা যায়; বিশেষ করে যখন সংশয়বাদীরা বলে যে, মৃত ব্যক্তি তো কবরে নড়াচড়া করে না এবং তার ওপরের মাটিও পরিবর্তিত হয় না (তাহলে শাস্তি হয় কীভাবে?)।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এই উদাহরণটি দিয়েছেন ঘুমন্ত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মধ্যকার সাদৃশ্য দেখানোর জন্য। একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি ব্যথা ও আনন্দ অনুভব করে; যদিও আমরা তার পাশে থাকলেও তা বুঝতে পারি না। কবরে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সম্ভবত সে শাস্তি ভোগ করছে অথবা শান্তিতে আছে, কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না বা জানি না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমাদের বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি সবকিছুকে বেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ مَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ اِلَّا قَلِیۡلًا

“আর তোমাদেরকে (মানবজাতিকে) সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।”[২৩]

---

[২১] সহীহ মুসলিম, ৬২৭।

[২২] সূরা আল-আদিয়াত, ১০০:৯-১০।

[২৩] সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫।

মহান আল্লাহ বলেন:

بَلۡ كَذَّبُوۡا بِمَا لَمۡ يُحِيۡطُوۡا بِعِلۡمِهٖ وَ لَمَّا يَاۡتِهِمۡ تَاۡوِيۡلُهٗ

“বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা বলেছে, যা তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে বেষ্টন করতে পারেনি এবং যার প্রকৃত অর্থ (বা পরিণাম) এখনও তাদের কাছে আসেনি।”[২৪]

একজন মুমিনের জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে, সে সেই সব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখবে এবং নিশ্চিত থাকবে, যা কোনো সহীহ বা অকাট্য দলিলের (কুরআন ও সুন্নাহ) মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে; চাই আপনার বুদ্ধি তা উপলব্ধি করতে পারুক বা না পারুক। অদৃশ্যের (গাইব) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো প্রকৃত মুমিনের মূল বৈশিষ্ট্য, যার প্রশংসা করা হয়েছে এবং যাকে বিশাল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় প্রার্থনা করি— তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

[২৪] সূরা ইউনুস, ১০:৩৯।

রূহ

ইবনে তাইমিয়্যাহ: মানুষ মূলত তার রূহ এবং শরীরের সমষ্টিগত একটি বহিঃপ্রকাশ; বরং তার শরীর অপেক্ষা রূহ-ই তার অধিকতর অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরীর তো রূহের জন্য কেবল একটি আরোহণের বাহন মাত্র। আবু দারদা (রা.) বলতেন, *"আমার শরীর কেবল একটি বাহন; যদি আমি এর প্রতি সদয় হই, তবে এটি আমাকে গন্তব্যে নিয়ে পৌঁছাবে। কিন্তু যদি আমি এর প্রতি সদয় না হই, তবে এটি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"*

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, *"সৃষ্টিজগতের মধ্যকার বিতর্ক চলতেই থাকবে, এমনকি রূহ ও শরীরের মধ্যেও বিতর্ক শুরু হবে। রূহ শরীরকে বলবে, 'তুমি পাপ করেছ!' শরীর রূহকে উত্তর দেবে, 'তুমিই তো আমাকে তা করার আদেশ দিয়েছিলে!' তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যকার এই বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাবেন।"*

সেই ফেরেশতা বলবেন, *"তোমাদের দুজনের উদাহরণ হলো—একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত (লুলা) ব্যক্তি এবং একজন অন্ধ ব্যক্তির মতো, যারা একটি বাগানে প্রবেশ করেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটি ঝুলন্ত ফল দেখতে পেল এবং সে অন্ধ লোকটিকে বলল, 'আমি ঝুলন্ত ফল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ফল পাড়ার জন্য দাঁড়িয়ে নাগালে পৌঁছানোর ক্ষমতা আমার নেই।' তখন অন্ধ লোকটি বলল, 'আমি তো দাঁড়িয়ে নাগালে পৌঁছাতে পারি, কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না।'*

তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি বলল, 'এখানে এসো এবং আমাকে ওপরে তুলে ধরো, যাতে আমি ফলগুলো পাড়তে পারি।' তখন অন্ধ লোকটি তাকে ওপরে তুলে ধরল এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি তাকে কোন দিকে যেতে হবে সেই নির্দেশনা দিতে লাগল, যাতে সে ফলগুলো পাড়তে পারে।"

ফেরেশতা প্রশ্ন করবেন, *"এখন বলো, শাস্তি এই দুজনের মধ্যে কার ওপর হওয়া উচিত?"* তখন রূহ ও শরীর উভয়ই বলবে, *"তাদের দুজনের ওপরই সম্মিলিতভাবে হওয়া উচিত।"* তখন ফেরেশতা বলবেন, *"ঠিক একইভাবে তোমাদের দুজনের (রূহ ও শরীর) ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।"*

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, শরীর থেকে রূহ বের করে আনা হবে এবং এরপর সে হয় সুখ ভোগ করবে অথবা শাস্তি ভোগ করবে।

- **উত্তম রূহ:** পবিত্র রূহকে বলা হবে, **"হে পবিত্র রূহ! বের হয়ে এসো, যা একটি পবিত্র শরীরে ছিলে।"** মুমিন ব্যক্তিকে তখন আরাম ও জীবনোপকরণের সুসংবাদ দেওয়া হবে।[২৫]

- **নিকৃষ্ট রূহ:** অন্যদিকে পাপিষ্ঠ রূহকে বলা হবে, **"বের হয়ে এসো হে নিকৃষ্ট রূহ! যা একটি নিকৃষ্ট শরীরে ছিলে।"** অবাধ্য রূহকে তখন ফুটন্ত পানি ও পুঁজ-রক্তের[২৬] মতো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দেওয়া হবে।

মুমিনের রূহ (মৃত্যুর পর) আসমানের দিকে আরোহণ করে, কিন্তু কাফিরের রূহের জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:

إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يَصْعَدَانِ بِهَا فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّتْنَ رَدَّ عَلَى أَنْفِهِ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ.

যখন কোনো মুমিনের রূহ শরীর থেকে বের হয়ে আসে, তখন দুজন ফেরেশতা সেটি গ্রহণ করেন এবং তা নিয়ে আসমানের দিকে আরোহণ করেন। আসমানের অধিবাসীরা (ফেরেশতারা) তখন বলতে থাকেন, **"পৃথিবীর দিক থেকে একটি পবিত্র রূহ এসেছে। আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সেই শরীরের ওপরও, যাতে তুমি বসবাস করতে।"** এরপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, **"তাকে তার চূড়ান্ত গন্তব্যের (সিজ্জিন বা ইল্লিয়্যিন) দিকে নিয়ে যাও।"** পক্ষান্তরে, যখন কোনো কাফিরের রূহ

---

[২৫] "(তার জন্য রয়েছে) আরাম, উত্তম রিযিক এবং সুখময় জান্নাত।" (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:৮৯)

[২৬] "সুতরাং তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক; এটি হলো ফুটন্ত পানি এবং ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ (ঘাসসাক)।" (সূরা সোয়াদ, ৩৮:৫৭)

শরীর থেকে বের হয়, তখন আসমানের অধিবাসীরা বলতে থাকেন, **"পৃথিবীর দিক থেকে একটি অপবিত্র রূহ এসেছে।"** আল্লাহ তাআলা বলবেন, **"তাকে তার চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাও।"** আবু হুরায়রা (রা.) উল্লেখ করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফিরের রূহের সেই দুর্গন্ধের কথা বর্ণনা করার সময় তাঁর কাছে থাকা একটি পাতলা কাপড় নাকের ওপর চেপে ধরেছিলেন।[২৭]

[২৭] সহীহ মুসলিম, ২৮৭২।

কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে মৃত ব্যক্তি এবং কবরের অভ্যন্তরে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তি কি তার কবরে কথা বলে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: মৃত ব্যক্তি কি তার কবরে কথা বলে– এই প্রশ্নের উত্তর হলো, সে অবশ্যই কথা বলে এবং যারা তার সাথে কথা বলে সে তাদের কথা শুনতেও পায়। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা.) বলেছেন:

إنه ليسمع قرع نعالهم

"নিশ্চয়ই সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের (দাফন করে ফিরে যাওয়া ব্যক্তিদের) জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়।"[২৮]

এবং এটিও তাঁর থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে প্রশ্ন করা হবে। তাকে বলা হবে, **"তোমার রব কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কী? এবং তোমার নবী কে?"**

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করেন।"[২৯]

(কবরে) মুমিন ব্যক্তি বলবে, **"আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নবী।"** তাকে বলা হবে, **"তোমার নিকট প্রেরিত এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?"** মুমিন বলবে, **"তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তিনি**

[২৮] সহীহ আল-বুখারী, ১৩০৮।

[২৯] সূরা ইবরাহিম, ১৪:২৭।

আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন; তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করেছি।”

এটিই হলো আল্লাহর সেই বাণীর ব্যাখ্যা— *“আল্লাহ ঈমানদারদেরকে শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন।”* নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতটি কবরের আজাব ও পরীক্ষার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুনাফিক ব্যক্তিও তার কবরে কথা বলবে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে, সে উত্তর দেবে— **“হায়! হায়! আমি জানি না! আমি মানুষকে কিছু একটা বলতে শুনতাম, তাই আমিও তা বলতাম!”** তখন তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, সে তীব্র চিৎকার করে উঠবে; মানুষ ছাড়া সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার সেই আর্তনাদ শুনতে পাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

“যদি এমন আশঙ্কা না থাকত যে, তোমরা তোমাদের মৃতদের দাফন করা ছেড়ে দেবে, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদের কবরের আজাব শোনান (যা আমি শুনতে পাই)।”[৩০]

বদর যুদ্ধের সময়, তিনি সেই সব মুশরিকদের নাম ধরে ডেকেছিলেন যাদের হত্যা করে একটি কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তখন সাহাবীগণ (বিস্মিত হয়ে) বলেছিলেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا.

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন সব লোকের সাথে কথা বলছেন যারা নিথর লাশে পরিণত হয়েছে?”

তিনি উত্তর দিলেন:

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا.

[৩০] সহীহ মুসলিম, ২৮৬৮।

“আমি যা বলছি, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছ না; কিন্তু তারা কোনো উত্তর দিতে সক্ষম নয়।”[৩১]

এই ধরণের বর্ণনা (হাদিসে) অসংখ্য রয়েছে।

---

[৩১] সুনান আন-নাসায়ী, ২০৭৫।

কবরের আজাব

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে কবরের আজাবকে সুসাব্যস্ত করেছেন এবং যারা এটি অস্বীকার করে তাদের কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সমস্ত মুসলিম এবং সকল আসমানী ধর্মের বিশ্বাস হলো—একটি মহাপরলয় বা কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করার জন্য। একইভাবে মৃত্যু এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী যে জগত (বারযাখ), সেখানেও পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এটি সমস্ত সালাফে সালেহীনদের সর্বসম্মত অভিমত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবস্থান। কেবল বিদআতিদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এটি অস্বীকার করে।

কালামশাস্ত্রবিদদের (People of Rhetoric) মধ্যে কেউ কেউ কবরের আজাব স্বীকার করেন ঠিকই, কিন্তু তারা বলেন যে—এই শাস্তি কেবল শরীরের ওপর হয়; আবার অন্য একদল বলে যে এটি কেবল রূহের ওপর হয়। এদের মধ্যে অনেকে আবার মনে করে যে মৃত্যুর পর শরীরের সাথে রূহের কোনো সম্পর্কই থাকে না; তাই তারা কবরে কোনো সুখ বা শাস্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। তারা দাবি করে যে, কুরআন বা সুন্নাহতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দিয়ে বোঝা যায় যে মৃত্যুর পর রূহ শরীরের সাথে সংযুক্ত থাকে। একইভাবে যারা কবরের আজাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তারাও কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণের অভাব দাবি করে।

কিন্তু তাদের এই দাবি ভুল। কুরআন একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছে যে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও রূহ টিকে থাকে এবং মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে সে সুখ বা শাস্তি ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে, আহলুস সুন্নাহর ঐকমত্য অনুযায়ী, **আজাব এবং নেয়ামত রূহ ও শরীর—উভয়ের ওপরই সংঘটিত হয়।** রূহ শরীর থেকে আলাদা অবস্থায় যেমন সুখ বা দুঃখ পায়, তেমনি শরীরের সাথে সংযুক্ত অবস্থায়ও তা ভোগ করে। যখন রূহ শরীরের সাথে যুক্ত থাকে, তখন উভয়ই সম্মিলিতভাবে তা অনুভব করে। আবার কোনো কোনো সময় কেবল রূহ একাকী তা ভোগ করে।

আল্লাহ তাআলা একটি সূরায় (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ) কিয়ামতের বড় বিচার (Major Judgment) এবং ছোট বিচার (Minor Judgment/মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা) উভয়টি নিয়েই

আলোচনা করেছেন। সূরার শুরুতে তিনি কিয়ামত এবং সেদিন মানুষ কীভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হবে তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿۲﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿۳﴾ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴿۴﴾ وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿۵﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ﴿۶﴾ وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿۷﴾

"যখন সংঘটিত হবে কিয়ামত, (তখন) এটার সংঘটন মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না। এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত; যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে যমীন, এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে পর্বতমালা, অতঃপর তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়; আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন দলে।"[৩২]

সূরার শেষে তিনি (আল্লাহ তাআলা) সেই 'ছোট বিচার' (Minor Judgment) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা মৃত্যুর সময় ঘটে থাকে। সেখানেও তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَوْ لَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿۸۳﴾ وَ اَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ فَلَوْ لَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿۸۶﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿۸۹﴾ وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۰﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۱﴾ وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۹۲﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿۹۳﴾ وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿۹۴﴾

"সুতরাং কেন নয়— প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক, আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার কাছাকাছি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। অতঃপর যদি তোমরা হিসাব নিকাশ ও প্রতিফলের সম্মুখীন না হও, তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও! অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান, আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়, তবে তাকে বলা হবে, তোমাকে সালাম যেহেতু তুমি ডান দিকের একজন। কিন্তু সে যদি হয় মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্তদের একজন, তবে তার আপ্যায়ন হবে অতি উষ্ণ পানির, এবং দহন জাহান্নামের।"[৩৩]

---

[৩২] সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:১-৭।

[৩৩] সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:৮৩-৯৪।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে কিয়ামত দিবসের শাস্তি এবং মৃত্যু ও পরকালের মধ্যবর্তী জগতের (বারযাখ) শাস্তিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। ফেরাউনের অনুসারীদের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿۴۵﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ۚ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۟ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾

"অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল কঠিন শাস্তি; আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে।"[৩৪]

এবং তিনি মুনাফিকদের জন্য যেসব শাস্তি রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ.

"অচিরেই আমরা তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব তারপর তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।"[৩৫]

একাধিক আলেম বলেছেন যে, প্রথম শাস্তিটি হলো এই পার্থিব জীবনে, আর দ্বিতীয় শাস্তিটি হলো মৃত্যু ও পরকালের মধ্যবর্তী জগতে (বারযাখ বা কবরে); এরপর তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে এবং পরকালের মহানতম শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আনআমে বলেন:

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ

"আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া

[৩৪] সূরা গাফির (বা মুমিন), ৪০:৪৫-৪৬।

[৩৫] সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১০১।

হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে।"[৩৬]

এই আয়াতে মৃত্যুর সময়কার ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছে। এটি একটি অকাট্য দলিল যে (শরীরে) আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে এবং মৃত্যুর সময় তা দেহ থেকে বের করে আনা হয়। আল্লাহর বাণী— **"আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেওয়া হবে"**—একথাটিই প্রমাণ করে যে, শাস্তির একটি অংশ মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায়; আর কবরের আজাব মূলত এই প্রক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে, সূরা আল-কিয়ামাহ-তেও আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের মহাসংঘটন (বড় বিচার) এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা (ছোট বিচার)—উভয়টিই একত্রে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

لَآ اُقۡسِمُ بِیَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ ۙ﴿۱﴾ وَ لَاۤ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَۃِ ؕ﴿۲﴾

"আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের, আমি আরও শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার।"[৩৭]

এটি মানুষের আত্মাকেই নির্দেশ করে। কেউ কেউ মনে করেন যে, কিছু আত্মা হবে আত্ম-তিরস্কারকারী (নফসে লাওয়ামা) আর কিছু আত্মা এমন হবে না; কিন্তু বিষয়টি আসলে তেমন নয়। প্রতিটি মানুষই এমন যে, তার আত্মা তাকে তিরস্কার করবে এবং সে অনুশোচনা করবে—হয় এই দুনিয়াতে, না হয় পরকালে। এরপর আল্লাহ তাআলা শরীরের পুনরুত্থান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

اَیَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَہٗ ؕ﴿۳﴾ اَیَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَہٗ ؕ﴿۳﴾ بَلۡ یُرِیۡدُ الۡاِنۡسَانُ لِیَفۡجُرَ اَمَامَہٗ ۚ﴿۵﴾ یَسۡـَٔلُ اَیَّانَ یَوۡمُ الۡقِیٰمَۃِ ؕ﴿۶﴾

[৩৬] সূরা আল-আনআম, ৬:৯৩।

[৩৭] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:১-২।

“মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না? অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়। সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামতের দিন আসবে?”[৩৮]

তিনি (আল্লাহ) সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

تَظُنُّ اَنۡ یُّفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿۲۵﴾

“আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।”[৩৯]

অতঃপর তিনি মৃত্যুর মুহূর্তটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ ﴿۲۶﴾

“অবশ্যই, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।”[৪০]

এটি নিশ্চিত করে যে, (মৃত্যুর সময়) আত্মা কণ্ঠনালী ও হাঁসুয়ালি হাড় পর্যন্ত চলে আসে। যেমনটি আল্লাহর এই বাণীতেও এসেছে:

فَلَوۡ لَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الۡحُلۡقُوۡمَ ﴿۸۳﴾

“সুতরাং কেন নয়—প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়।”[৪১]

উল্লেখ্য যে, হাঁসুয়ালি হাড় বা ‘কলার বোন’ কণ্ঠনালীর সাথেই সংযুক্ত। এরপর তিনি বলেন:

وَ قِیۡلَ مَنۡ ٜ رَاقٍ ﴿۲۷﴾

“এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে?”[৪২]

---

[৩৮] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:৩-৬।

[৩৯] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২৫।

[৪০] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২৬।

[৪১] সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:৮৩।

[৪২] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২৭।

এই আয়াতের একটি অর্থ হলো—কে আছে এমন যে তাকে সুস্থ করার জন্য রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) করবে? আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো—কে তার আত্মাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে? তবে প্রথম অর্থটিই অধিকতর স্পষ্ট, কারণ এই অবস্থাটি মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে ঘটে থাকে।

وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الۡفِرَاقُ ﴿ۙ۲۸﴾

"তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।"[৪৩]

এটি প্রমাণ করে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির চারপাশের মানুষজন তাকে সুস্থ করার জন্য কাউকে খোঁজে এবং চেষ্টা চালায়। আল্লাহর কাছে তার আত্মা নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে খোঁজার প্রয়োজন তাদের নেই; কারণ আল্লাহর এমন ফেরেশতা রয়েছে যারা তাঁর আদেশ অনুযায়ী এই কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

রুকইয়া হলো সর্বোত্তম ঔষধ, কারণ এটি সরাসরি আত্মার চিকিৎসা করে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তখন বলেছেন:

لَا يَسْتَرْقُونَ

"তারা (অন্যের কাছে) রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁকের অনুরোধ করে না।"[৪৪]

সুতরাং, আয়াতের মূল মর্ম হলো—সে (মৃত্যু পথযাত্রী) আশঙ্কা করে যে সে মারা যাচ্ছে, তাই সে কারো চিকিৎসার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চায়। এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন, *"আর সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, এটিই বিদায়ের সময়।"*

এরপর তিনি (আল্লাহ) বলেন:

وَ الۡتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ۙ۲۹﴾ اِلٰی رَبِّكَ یَوۡمَئِذِ الۡمَسَاقُ ﴿ؕ۳۰﴾

---

[৪৩] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২৮।

[৪৪] সহীহ মুসলিম, ২১৮।

"আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।"[৪৫]

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, রূহ বা আত্মা শরীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে বের হয়ে আসে এবং তার প্রতিপালকের দিকে আরোহণ করে; কিন্তু শরীর স্বতন্ত্রভাবে বের হয় না এবং মৃত্যুর সময় সেটি আসমানে আরোহণ করে না। এই বর্ণনাটি নিশ্চিত করে যে, মৃত্যুর সময় আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একে তার প্রতিপালকের সমীপে নিয়ে যাওয়া হয়।

---

[৪৫] সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫:২৯-৩০।

কবরে দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে কবরের প্রশ্নোত্তর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: (কবরে আত্মা ফিরে আসা সম্পর্কে) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ : ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجئ بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة

"পক্ষান্তরে, যখন কোনো অবিশ্বাসী (কাফির) বান্দা দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের পথে যাত্রা করে, তখন আকাশ থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা চট বা মোটা কাপড় নিয়ে নেমে আসে। তারা তার চোখের দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত ঘিরে বসে। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার পাশে বসেন এবং বলেন, 'হে পাপিষ্ঠ আত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে

এসো।’ তখন সেই আত্মা শরীরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীরের রগ ও স্নায়ু ছিঁড়ে বের হয়ে আসে; ঠিক যেভাবে ভেজা পশমের ভেতর দিয়ে গরম লোহার শিক টেনে বের করা হয়।

ফেরেশতা যখন তা কবজ করেন, তখন অন্যান্য ফেরেশতারা এক মুহূর্তের জন্যও তা তাঁর হাতে থাকতে দেয় না। তারা সাথে সাথে সেই চটের কাপড়ে আত্মাটিকে মুড়িয়ে নেয়। তখন তা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে পচা লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও জঘন্য দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে। এরপর তারা সেটি নিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই তারা যায়, তারাই জিজ্ঞেস করে, ‘এই পাপিষ্ঠ আত্মাটি কার?’ তখন তারা দুনিয়াতে তাকে যে জঘন্যতম নামে ডাকা হতো সেই নাম ধরে বলে, ‘এটি অমুকের পুত্র অমুক।’ এভাবে তারা নিম্নাকাশ পর্যন্ত পৌঁছায়। তারা আকাশ খোলার আবেদন জানালে তা খোলা হয় না।”

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন:

“তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।” (সূরা আল-আ’রাফ, ৭:৪০)

অতঃপর তিনি বলেন, “তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘আমার এই বান্দার আমলনামা সর্বনিম্ন জমিনে অবস্থিত ‘সিজ্জিন’-এ লিপিবদ্ধ করো এবং তাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি মাটি থেকেই তাদের সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই আবার বের করে আনব।’ তখন তার আত্মাটিকে ওপর থেকে ছুড়ে ফেলা হয়।”

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন:

“আর যে আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।” (সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩১)

তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, “অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাঁরা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার প্রতিপালক কে?’ সে বলে, ‘হায়! হায়! আমি জানি না।’ তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার দ্বীন কী?’ সে বলে, ‘হায়! হায়! আমি জানি না।’ তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করেন, ‘এর জন্য জাহান্নামের বিছানা পেতে দাও, তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও।’ তখন সেখান থেকে জাহান্নামের উত্তাপ ও গরম হাওয়া

আসতে থাকে এবং তার কবর এতোটা সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার এক পাঁজরের হাড় অন্য পাঁজরের ভেতরে ঢুকে যায়।

এরপর তার সামনে কুৎসিত চেহারা, নোংরা পোশাক এবং দুর্গন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি এসে হাজির হয়। সে বলে, 'তোমার জন্য দুঃসংবাদ! এটিই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।' সে (মৃত ব্যক্তি) জিজ্ঞাসা করে, 'কে তুমি? তোমার চেহারা তো অমঙ্গল বয়ে আনা চেহারার মতো।' সে উত্তর দেয়, 'আমি তোমার অসৎ কর্ম।' তখন সে বলতে থাকে, 'হে প্রভু! কিয়ামত যেন কখনোই না হয়'।"[৪৬]

এই হাদিসটি থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়, যেমন:

- দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও আত্মা অবশিষ্ট থাকে (বিলীন হয়ে যায় না); যা ভ্রান্ত যুক্তিবাদীদের মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত।
- আত্মা আসমানে আরোহণ করে এবং নিচে অবতরণ করে; যা বিভ্রান্ত দার্শনিকদের মতামতের পরিপন্থী।
- আত্মাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আনা হয়; মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং সে অনুযায়ী সে সুখ অথবা শাস্তি ভোগ করে।
- সৎকর্ম কবরে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে।
- অসৎকর্ম কবরে অত্যন্ত কুৎসিত ও বীভৎস রূপে হাজির হয়।

ইবনে আবিদ দুনিয়া[৪৭] তাঁর 'রিমেমব্রেন্স অব ডেথ' (মৃত্যুর স্মরণ) গ্রন্থে আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, (মৃত্যুর পর) আত্মাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং এটি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।" এই বক্তব্যটি সেইসব বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেগুলোতে বলা হয়েছে—আত্মা কবরস্থানেই অবস্থান করতে

[৪৬] মুসনাদে আহমাদ, ১৮৫৫৭।

[৪৭] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন বাগদাদের প্রখ্যাত আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি হিজরি ২০৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

পারে; যেমনটি মুজাহিদ[৪৮] বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সাত দিন পর্যন্ত তার আত্মা কবরের পাশেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে চলে যায় না।"

কবরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ছাড়াও অন্য সময়েও আত্মা দেহে ফিরে আসতে পারে। বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

ما مِن رَجُلٍ يمر بقبرِ الرَّجُلِ كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلام

"যখন কোনো ব্যক্তি তার পরিচিত কোনো মৃত ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যায় এবং তাকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহ ওই মৃত ব্যক্তির আত্মা তার কাছে ফিরিয়ে দেন যাতে সে সালামের উত্তর দিতে পারে।"[৪৯]

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي" فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول : بليت، قال: "إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء

"নিশ্চয়ই তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমাবার হলো সর্বোত্তম; তাই এই দিনে তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমাদের এই দরুদ আমার সামনে পেশ করা হয়।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন কীভাবে আমাদের দরুদ আপনার সামনে পেশ করা হবে?" তিনি উত্তর

---

[৪৮] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন প্রখ্যাত ইমাম ও আলেম মুজাহিদ ইবনে জাবর, যিনি তাবিঈদের (দ্বিতীয় প্রজন্ম) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হিজরি ২১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আয়েশা, ইবনে উমর, উম্মে হানী (নবীজির চাচাতো বোন), আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) প্রমুখের নিকট ইলম অর্জন করেছেন। তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে তিনবার সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছিলেন এবং প্রতিটি আয়াতের প্রেক্ষাপট ও নিহিত জ্ঞান সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। (ইমাম আয-যাহাবীর 'সিয়ার আলামুন নুবালা' থেকে সংগৃহীত)।

[৪৯] তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩/৪৩৯।

দিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নবীদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"[৫০]

এমন অসংখ্য হাদিস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ যদি চান তবে কবরে দেহ সুখ অথবা শাস্তি ভোগ করবে এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা করবেন। আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরও সেটি সুখ অথবা শাস্তির মধ্যে থাকে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন মৃত ব্যক্তিদের সালাম দেওয়ার জন্য। তিনি তাঁর সাহাবীদের শিখিয়েছিলেন যে, তাঁরা যখন কবরস্থান জিয়ারত করবেন তখন যেন বলেন:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاحِقُونَ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُم واغفر لنا ولهم

"হে কবরের বাসিন্দা মুমিনগণ, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে চলে গেছেন এবং যারা পরে আসবেন—সবার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আমরা আমাদের এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের তাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তাদের পরে আমাদের পরীক্ষায় ফেলবেন না।"[৫১]

অনেকের কাছেই কবরের এই জগতটি উন্মোচিত হয়েছে, এমনকি তারা কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আর্তনাদও শুনতে পেয়েছেন। আবার অনেকে স্বচক্ষে তাদের কবরে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শরীরকে সব সময় বা সারাক্ষণ শাস্তি দেওয়া হবে; বরং কখনো শাস্তি দেওয়া হয়, আবার কখনো বন্ধ রাখা হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ترك قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا . فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ

[৫০] আবু দাউদ, ১০৪৭।

[৫১] সহীহ মুসলিম, ৯৭৪।

يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا " . ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মৃতদেহগুলো তিন দিন পর্যন্ত (গর্তে) না ফেলে রেখে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে পাশে বসলেন এবং তাদের নাম ধরে ডেকে বললেন, **"হে আবু জেহেল ইবনে হিশাম, হে উমাইয়া ইবনে খালাফ, হে উতবা ইবনে রাবিয়া, হে শায়বা ইবনে রাবিয়া! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা কি তা সত্য হিসেবে পেয়েছ? আমি তো আমার প্রতিপালকের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্য হিসেবে পেয়েছি।"** ওমর (রা.) আল্লাহর রাসূলের এই কথা শুনে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার কথা কীভাবে শুনছে এবং উত্তর দিচ্ছে? তারা তো মৃত এবং তাদের দেহ পচে গেছে।" তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, **"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাদের যা বলছি, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে তা শুনতে পাচ্ছ না; কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছে না।"** এরপর তাঁর আদেশে তাদের বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়।[৫২]

কাতাদাহ[৫৩] বলেন, **"আল্লাহ তাদের পুনর্জীবিত করেছিলেন যাতে তারা তাদের লাঞ্ছনা ও শাস্তি শুনতে পায় এবং এটি যেন তাদের জন্য চরম অনুশোচনার কারণ হয়।"** আর মহান আল্লাহর এই বাণীর ক্ষেত্রে:

اِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ الۡمَوۡتٰى

"নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে শোনাতে পারবেন না।"[৫৪]

—এখানে মূলত সেই স্বাভাবিক শোনার কথা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের উপকারে আসে। এই উদাহরণটি কাফিরদের জন্য দেওয়া হয়েছে, যদিও কাফিররা শুনতে পায়। কিন্তু তারা সত্য গ্রহণ, অনুধাবন এবং অনুসরণের উদ্দেশ্যে শোনে না। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন:

---

[৫২] সহীহ মুসলিম, ২৮৭৪।

[৫৩] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন প্রখ্যাত ইমাম ও আলেম কাতাদাহ ইবনে দিয়ামা। তিনি হিজরি ৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

[৫৪] সূরা আন-নামল, ২৭:৮০।

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً

"আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত যে, এমন কিছুকে ডাকছে যে হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনে না।"[৫৫]

মৃতদের অবস্থাও ঠিক তেমন; তারা যেমন তাদের শোনা থেকে উপকৃত হতে পারে না, ঠিক তেমনি কাফিররাও যা শোনে তা থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারে না।

[৫৫] সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৭১।

কাফিরদের কবর জিয়ারত

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কাফিরদের কবর জিয়ারত করা জায়েজ। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন:

زَارَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করলেন এবং কাঁদলেন। তাঁর কান্না দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেললেন। এরপর তিনি বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তাঁর (মায়ের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সেই অনুমতি দেননি। আর আমি তাঁর কবর জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, তোমরা কবর জিয়ারত করো; কারণ এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'"[৫৬]

কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য যদি হয় মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, তবে তা কেবল মুমিনদের কবরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যদিকে, কবর জিয়ারতের এমন কিছু ধরণ রয়েছে যা মূলত 'বিদআত' (ধর্মের নামে নতুন প্রথা)। যেমন—মৃত ব্যক্তির কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর আবেদন করা, অথবা তার কাছে দোয়া ও সুপারিশ কামনা করা। একইভাবে এই উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করাও বিদআত যে, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ জাতীয় কোনো জিয়ারতই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তন করেননি এবং সাহাবীগণের কেউ এমনটি করেননি। সাহাবীগণ নবীজির কবরের পাশেও এমনটি করেননি এবং অন্য কারো কবরের কাছেও করেননি। বরং এগুলো শিরকের পর্যায়ভুক্ত এবং শিরকের দিকে ধাবিত হওয়ার একটি মাধ্যম।

যদি কারো উদ্দেশ্য হয় নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের কাছে নামাজ আদায় করা—যদিও সে তাঁদের কাছে কিছু না চায় কিংবা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে (বিশেষভাবে) দোয়া না-ও করে—তবে এটিও তাঁদের কবরস্থানকে ইবাদতখানায় পরিণত করার শামিল। এটি সম্পূর্ণ

---

[৫৬] সহীহ মুসলিম, ৯৭৬।

নাজায়েয এবং নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের মুখে ঠেলে দেবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"আল্লাহর ক্রোধ সেই জাতির ওপর অত্যন্ত কঠোর হয়েছে, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে।"[৫৭]

তিনি আরও বলেছেন:

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হোক; তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছিল।"[৫৮]

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাণীর মাধ্যমে তাঁদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবরসমূহকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে ইবাদতখানা বানিও না। আমি তোমাদের এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করছি।"[৫৯]

সুতরাং, কবরকে ইবাদতখানা বানানো যদি নিষিদ্ধ হয় এবং আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের কারণ হয়, তবে সেইসব লোকেদের অবস্থা কত ভয়াবহ—যারা সরাসরি মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে কিংবা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এই বিশ্বাসে দোয়া করতে যায় যে, এটি দোয়া কবুল হওয়ার এবং প্রয়োজন পূরণের একটি মাধ্যম!

---

[৫৭] মুয়াত্তা মালিক, ৪১৬।

[৫৮] সুনানে আবু দাউদ, ৩২২৭।

[৫৯] সহীহ মুসলিম, ৫৩২।

মূলত এটিই ছিল পৃথিবীর বুকে মানুষের শিরক এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ, যা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির মধ্যে ঘটেছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, **"আদম এবং নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছিল; যাদের সবাই ইসলামের (একত্ববাদের) ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মানুষেরা তাদের মধ্যবর্তী নেককার ব্যক্তিদের কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতি-ভক্তি শুরু করলে শিরকের আবির্ভাব ঘটে।"**[৬০]

মহান আল্লাহ বলেন:

وَ قَالُوۡا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمۡ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۬ۙ وَّ لَا یَغُوۡثَ وَ یَعُوۡقَ وَ نَسۡرًا ﴿۲۳﴾

"এবং বলেছে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে।"[৬১]

ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, **"এঁরা ছিলেন নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির মধ্যকার নেককার ব্যক্তি। যখন তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তখন লোকেরা তাঁদের কবরে নির্জনে অবস্থান (ইতিকাফ) করতে শুরু করে; এরপর তাঁরা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরি করে এবং এক পর্যায়ে তাঁদের উপাসনা শুরু করে।"**[৬২] ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বলেন, **"পরবর্তীতে এই মূর্তিগুলোই আরবদের মাঝে প্রচলিত হয়ে যায়।"**

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যখন এই মূর্তিগুলোর পূজা করে, তখন শয়তানরা তাদের সাথে কথা বলে এবং এমন সব কাজ করে যার ফলে তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট হয়। তারা এই কবরগুলোকে মূর্তিতে পরিণত করেছে, যা মানুষের শিরকে লিপ্ত হওয়ার প্রথম কারণ। এই কারণেই কিছু মানুষ কবরের কাছে কথা শুনতে পায়; তারা বিভিন্ন অবয়ব দেখতে পায় এবং অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে দেখে। তারা বিশ্বাস করে যে এগুলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঘটছে, অথচ এগুলো মূলত জিন বা শয়তানের কাজ। উদাহরণস্বরূপ, তারা হয়তো দেখে যে কবর চিরে গেল এবং মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে কথা বলছে ও তাদের আলিঙ্গন করছে। এটি নবীদের কবরে বা অন্য কারো কবরেও দেখা যেতে পারে; কিন্তু বাস্তবে

---

[৬০] ইবনে জারীর, ২/৩৩৪।

[৬১] সূরা নূহ, ৭১:২৩।

[৬২] সহীহ বুখারী, ৪৯২০।

সেটি কেবলই একটি শয়তান। শয়তান কোনো মানুষের রূপ ধারণ করে দাবি করে যে সে অমুক নবী বা অমুক শায়খ; কিন্তু তার এই দাবিতে সে একজন মিথ্যাবাদী। অজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে কবর থেকে বেরিয়ে আসা, কথা বলা বা আলিঙ্গন করা ব্যক্তিটিই সেই মৃত নবী বা নেককার ব্যক্তি; কিন্তু মুমিন ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে এটি শয়তান। এটি বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পেতে পারে।

একটি পদ্ধতি হলো—ব্যক্তি যদি আন্তরিকতার সাথে **আয়াতুল কুরসি**[৬৩] পাঠ করে। যখন সে এটি পাঠ করবে, তখন সেই দৃশ্যমান অবয়বটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, মাটির নিচে দেবে যাবে অথবা বিলীন হয়ে যাবে। যদি সেটি কোনো নেককার ব্যক্তি, ফেরেশতা কিংবা কোনো মুমিন জিন হতো, তবে আয়াতুল কুরসি তার কোনো ক্ষতি করত না। এটি কেবল শয়তানদেরই ক্ষতি করে। যেমনটি এক জিন আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলেছিল:

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَا آيَةَ الْكُرْسِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ

"যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে; তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সে তোমাকে সত্য বলেছে, যদিও সে একজন চরম মিথ্যাবাদী।"[৬৪]

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা (আউযুবিল্লাহ পাঠ করা)।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো—শরীয়তসম্মত পানাহ চাওয়ার দোয়া পাঠ করা। শয়তানরা নবীদের জীবদ্দশাতেও তাঁদের ক্ষতি করার কিংবা তাঁদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে আসত। একবার এক জিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আগুনের শিখা নিয়ে এসেছিল তাঁকে পুড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর কাছে এই বর্ণনায় উল্লিখিত পানাহ চাওয়ার দোয়াটি নিয়ে আসেন।

---

[৬৩] **অনুবাদকের নোট:** এটি সূরা আল-বাকারাহ'র ২৫৫ নম্বর আয়াত।

[৬৪] সহীহ আল-বুখারী, ৩২৭৫।

আবু তায়াহ জনৈক প্রবীণ সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে খানবাশ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "শয়তানরা যখন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন তিনি কী করেছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তারা একটি উপত্যকায় তাঁর ওপর চড়াও হয়েছিল। তাদের মধ্যে এক শয়তানের কাছে আগুনের মশাল ছিল, যা দিয়ে সে আল্লাহর রাসূলকে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এতে আল্লাহর রাসূল কিছুটা বিচলিত হলেন। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর কাছে এসে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি পাঠ করুন' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কী পাঠ করব?' জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'বলুন—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা বা বাণীর আশ্রয় নিচ্ছি—যা কোনো সৎ ব্যক্তি বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না—আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তার অনিষ্ট থেকে; আকাশ থেকে যা নেমে আসে এবং আকাশে যা আরোহণ করে তার অনিষ্ট থেকে; জমিনে যা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জমিন থেকে যা বের হয়ে আসে তার অনিষ্ট থেকে; রাত ও দিনের ফিতনা বা অনিষ্ট থেকে; এবং রাতে বা দিনে হঠাৎ আগত প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে, তবে কল্যাণ নিয়ে আগমনকারী ছাড়া—হে পরম দয়ালু!"[৬৫]

যদি শয়তান নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ক্ষতি করতে এবং তাঁদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাতে আসতে পারে—যাঁদের আল্লাহ বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে রক্ষা করেছেন—তবে নবীদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার মানুষদের ক্ষেত্রে তা কত বেশি হতে পারে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান ও আমলের শক্তির মাধ্যমে মানুষ ও জিন শয়তানদের বশীভূত করেছিলেন; যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো জিহাদ এবং সালাত। যারা নবীদের অনুসরণ করবে, তারা নবীদের মতোই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

পক্ষান্তরে, যারা ধর্মে এমন সব নতুন বিষয় (বিদআত) উদ্ভাবন করে যা শরীয়তসম্মত নয়, যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করার এবং রাসূলের অনুসরণের আদেশ পরিত্যাগ করে

---

[৬৫] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪১৯।

এবং নেককার ব্যক্তিদের নিয়ে সীমালঙ্ঘন করে—শয়তান তাদের নিয়ে খেলা করে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন:

اِنَّهٗ لَيۡسَ لَهٗ سُلۡطٰنٌ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ ﴿۹۹﴾ اِنَّمَا سُلۡطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ يَتَوَلَّوۡنَهٗ وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ بِهٖ مُشۡرِكُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।"[৬৬]

[৬৬] সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৯-১০০।

নবীজি (সা.)-এর পিতামাতা

শায়খ ফাওজান: শায়খকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—এই কথাটি কি সঠিক যে, আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতামাতাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন এবং তাঁরা নবীজির দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এরপর আবার মৃত্যুবরণ করেছিলেন?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: হাদিস শাস্ত্রের কোনো একজন আলেমের নিকটও এই কথাটি সঠিক নয়। বরং আহলে ইলম বা বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, এটি একটি বানোয়াট মিথ্যা; যদিও আবু বকর আল-খতিব আল-বাগদাদী তাঁর 'আল-সাবিক ওয়াল লাহিক' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এটি যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট মিথ্যা—এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। হাদিসের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাব, যেমন—সহীহ বুখারী, মুসলিম কিংবা সুনান গ্রন্থগুলোর কোথাও এই বক্তব্য পাওয়া যায় না। এমনকি তাফসীরের কিতাবগুলোতেও এর কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি এমন কোনো ঘটনা বাস্তবে ঘটত, তবে তা অসংখ্য বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হতো; কারণ এটি হতো স্বভাববিরুদ্ধ এক অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে সেই বর্ণনাটিকে খণ্ডন করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে—নবীজি (সা.)-এর পিতামাতাকে জীবিত করা হয়েছিল, তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পুনরায় মারা গিয়েছিলেন। এই দাবিটি কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ঐকমত্যের (ইজমা) পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّمَا التَّوۡبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السُّوۡٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوۡبُوۡنَ مِنۡ قَرِيۡبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوۡبُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿۱۷﴾ وَ لَيۡسَتِ التَّوۡبَةُ لِلَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ اِنِّىۡ تُبۡتُ الۡـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيۡنَ يَمُوۡتُوۡنَ وَ هُمۡ كُفَّارٌ ؕ

"আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি তাওবাহ করে, এরাই তারা, যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তাওবাহ্ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের

কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।"[৬৭]

আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করেছেন যে, যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য কোনো তওবা নেই। মহান আল্লাহ আরও বলেন:

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ۚ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

"কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না। আল্লাহর এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে।"[৬৮]

আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে তাঁর চিরাচরিত নিয়ম হলো—শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনলে তা কোনো উপকারে আসে না; তাহলে মৃত্যুর পর ঈমান কীভাবে কারো উপকারে আসতে পারে? আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন:

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي "قَالَ فِي النَّارِ" . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ".

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়?" তিনি উত্তর দিলেন, "জাহান্নামে।" লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমার পিতা এবং তোমার পিতা (উভয়েই) জাহান্নামে।"[৬৯]

এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের সম্পর্কে বলেছেন:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَ ورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

"আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তাঁর (মায়ের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সেই অনুমতি দেননি। আর আমি তাঁর কবর জিয়ারত করার অনুমতি

---

[৬৭] সূরা আন-নিসা, ৪:১৭-১৮।

[৬৮] সূরা গাফির, ৪০:৮৫।

[৬৯] সহীহ মুসলিম, ২০৩।

চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, তোমরা কবর জিয়ারত করো; কারণ এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৭০]

তিনি আরও বলেছেন:

إن أمي وأمك في النا

"নিশ্চয়ই আমার মা এবং তোমার মা জাহান্নামে।"[৭১]

কেউ কেউ বলেন, "এই বক্তব্যটি মক্কা বিজয়ের বছর প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পিতামাতা পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন বিদায় হজের সময়।" আর মূলত এই কারণেই কিছু মানুষ এই ধরনের মত পোষণ করেন। আমরা বলেছি যে, বেশ কিছু কারণে এই দাবিটি বাতিল বা অসার।

প্রথমত: অতীত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কিত এই ধরনের তথ্যসমূহ কখনোই 'মানসুখ' বা রহিত হওয়ার যোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ আবু লাহাব সম্পর্কে বলেছেন:

سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ﴿٣﴾

"অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে,"[৭২]

এবং তিনি আল-ওয়ালিদ[৭৩] সম্পর্কে বলেছেন:

سَأُرۡهِقُهُۥ صَعُودًا ﴿١٧﴾

"অচিরেই আমি তাকে চড়ার শাস্তি দিয়ে কষ্ট-ক্লান্ত করব।"[৭৪]

---

[৭০] সহীহ মুসলিম, ৯৭৬।

[৭১] মুসনাদে আহমাদ, ৪/১১।

[৭২] সূরা আল-মাসাদ, ১১১:৩।

[৭৩] **অনুবাদকের নোট:** ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগীরা ছিলেন একজন মূর্তিপূজক এবং ইসলামের শত্রু। তিনি দুই জন মহান সাহাবী—খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ এবং ওয়ালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ (রা.)-এর পিতা।

[৭৪] সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪:১৭।

এই দুটি আয়াত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই বাণীর মতোই— ”নিশ্চয়ই আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে,” এবং “নিশ্চয়ই আমার মা এবং তোমার মা জাহান্নামে।” এই বর্ণনাগুলোতে এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি যে, তাঁর পিতামাতাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে; যেমনটি বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অবশেষে সেখান থেকে বের হতে পারবে। যদি তেমন কিছু হতো, তবে নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হতো। তাঁর পিতামাতা যদি মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে বাধা দিতেন না। যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। সুতরাং, তাদের জন্য মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ হতো না।

দ্বিতীয়ত: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করেছিলেন কারণ মক্কা বিজয়ের বছর যখন তাঁরা হজ্জ পালন করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মায়ের কবর মক্কার পথেই ছিল। কিন্তু তাঁর পিতার বিষয় ছিল ভিন্ন; তিনি একই কবরস্থানে সমাহিত ছিলেন না। নবীজি (সা.) তাঁর পিতার কবর জিয়ারত করেননি, কারণ তাঁর পিতা শামে (সিরিয়া অঞ্চলে) সমাহিত ছিলেন এবং মক্কা যাওয়ার পথে তিনি সেই জায়গা অতিক্রম করেননি। সুতরাং, কীভাবে এটি দাবি করা যেতে পারে যে, তাঁর পিতামাতাকে তাঁর কাছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল?

তৃতীয়ত: যদি তাঁর পিতামাতা এমন ঈমান নিয়ে মুমিন হতেন যা তাঁদের উপকারে আসত, তবে তাঁর দুই চাচা—হামজা ও আব্বাস (রাজিআল্লাহু আনহুমা), যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের চেয়েও তাঁর পিতামাতার বিষয়টি জানাজানি হওয়া এবং উল্লিখিত হওয়ার বেশি হকদার ছিল। এটি আরও প্রমাণ করে যে, মূর্খ রাফেযী সম্প্রদায়ের সেই দাবিটি কতটা ভিত্তিহীন যখন তারা দাবি করে যে, নবীজির চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাদের এই দাবির সপক্ষে ইতিহাসের বইয়ের কিছু দুর্বল বর্ণনা পেশ করে থাকে। তারা দাবি করে যে, মৃত্যুর সময় আবু তালিব অতি গোপনে কালিমা পাঠ করেছিলেন এবং তাঁর ভাই আব্বাস (রা.) তা শুনতে পেয়েছিলেন।

অথচ আব্বাস (রা.) যদি তাঁকে কালিমা পাঠ করতে শুনতেনই, তবে তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমনটি বলতেন না যে:

عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته بشيء ؟ فقال : وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

"আপনার চাচা—সেই বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট মানুষটি—আপনাকে সাহায্য করতেন; আপনি কি এখন তাঁর কোনো উপকারে আসতে পারবেন?" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আমি তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত অবস্থায় পেয়েছি, অতঃপর আমি সুপারিশ করেছি যেন তাকে জাহান্নামের উপরিভাগে (কম গভীর অংশে) রাখা হয়। তার পায়ে আগুনের দুটি জুতো থাকবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যদি আমি না থাকতাম, তবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকত।"[৭৫]

মৃত্যুর সময় তিনি অতি গোপনে কালিমা পাঠ করেছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এটি বিশুদ্ধ দলিলসমূহের পরিপন্থী। তাঁর শেষ কথা ছিল—তিনি (তাঁর পিতা) আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর অটল আছেন। এছাড়া আবু তালিবের মৃত্যুর সময় আব্বাস (রা.) সেখানে উপস্থিতও ছিলেন না। যদি এই দাবি সত্য হতো, তবে হামজা ও আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদের চেয়ে এটি জানাজানি হওয়ার বেশি দাবি রাখত। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো আলেমই আবু তালিব কিংবা নবীজি (সা.)-এর পিতামাতাকে তাঁর পরিবারের মুমিন সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেননি—যেভাবে তাঁরা হামজা, আব্বাস, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে থাকেন। এটিই সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে, ওই দাবিটি একটি মিথ্যাচার।

চতুর্থত: মহান আল্লাহ বলেছেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ

"অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর

---

[৭৫] সহীহ বুখারী, ৩৬৭০; সহীহ মুসলিম, ২০৯; এবং মুসনাদে আহমাদ, ১/২১০।

পরিবর্তে যার ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না।”[৭৬]

এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

وَ مَا كَانَ اسۡتِغۡفَارُ اِبۡرٰهِیۡمَ لِاَبِیۡهِ اِلَّا عَنۡ مَّوۡعِدَۃٍ وَّعَدَهَاۤ اِیَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنۡهُ ؕ اِنَّ اِبۡرٰهِیۡمَ لَاَوَّاهٌ حَلِیۡمٌ ﴿۱۱۴﴾

“আর ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।”[৭৭]

সুতরাং, আমাদের ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সাথীদের আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—কেবল ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অংশটি বাদে। কারণ যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

---

[৭৬] সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৪।

[৭৭] সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১১৪।

শিশুরা জন্মগতভাবে ফিতরাত বা স্বভাবজাত ধর্মের ওপর জন্মায়

শায়খ ফাওজান: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

"প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (মানুষের আদি ও স্বভাবজাত প্রকৃতি) এর ওপর জন্মগ্রহণ করে।"[৭৮]

এর অর্থ কি সৃষ্টির স্বাভাবিক অবস্থা নাকি ইসলাম? এছাড়া নবীজির এই বাণীর অর্থ কী:

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

"সেই ব্যক্তিই দুর্ভাগা, যে তার মায়ের গর্ভেই দুর্ভাগা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।"[৭৯]

এটি কি বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে নাকি এটি সাধারণ সবার জন্য? এবং আল্লাহ কি কিয়ামতের দিন পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীদের পুনরায় জীবিত করবেন?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নবীজির এই বাণী সম্পর্কে:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَ سَانِهِ.

"প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে; অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।"[৮০]

---

[৭৮] সহীহ বুখারী, ১২৯২।

[৭৯] সহীহ মুসলিম, ২৬৪৫।

[৮০] সহীহ বুখারী, ১২৯২।

সঠিক মত হলো—এটি সেই স্বভাবজাত প্রকৃতি যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটি মূলত ইসলামেরই প্রকৃতি। এটি সেই আদি স্বভাব যার ওপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন:

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰی ۚۛ شَهِدْنَا ۚۛ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ﴿۱۷۲﴾

"আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম-সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম।"[৮১]

এটি হলো সমস্ত ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা। এটি হলো সুস্থ, সঠিক বিশ্বাস এবং আকিদাকে গ্রহণ করে নেওয়ার এক সহজাত ক্ষমতা। ইসলামের প্রকৃত সারমর্মই হলো—কেবল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত না করা। এটিই হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই)-এর প্রকৃত অর্থ। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুরা ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

"যেমন পশুরা তাদের শাবক প্রসব করে যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণাঙ্গ ও অক্ষত থাকে; তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনোটি কান-কাটা বা বিকলাঙ্গ দেখতে পাও?"[৮২]

তিনি এই উদাহরণটি দিয়েছেন এটি বোঝাতে যে, অন্তর যেমন ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তেমনি শরীরও ত্রুটিহীনভাবেই জন্মায়; আর পরবর্তীতে যে ত্রুটি বা বিকৃতি দেখা যায় তা একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন:

---

[৮১] সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭২।

[৮২] সহীহ বুখারী, ১৩৫৮ এবং সহীহ মুসলিম, ২৬৫৮।

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُ فَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.

"আমি আমার বান্দাদের একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি অনুরাগী (হুনাফা) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের কাছে এসে তাদের সঠিক দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়, তাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছিল তা সে হারাম করে দেয় এবং সে তাদের নির্দেশ দেয় যেন তারা আমার সাথে শরিক সাব্যস্ত করে—যার পক্ষে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি।"[৮৩]

এই কারণেই ইমাম আহমাদ এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে—যদি কোনো শিশুর পিতামাতা উভয়েই কাফির হয় এবং তারা মারা যায়, তবে শিশুটিকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ তার স্বভাবজাত ইসলামকে পরিবর্তন করার মতো যে প্রভাবকটি (পিতামাতা) ছিল, তা অপসারিত হয়েছে। এই মতটি তাঁর (ইমাম আহমাদ) এবং ইবনে আল-মুবারক থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা উভয়েই আরও বলেছেন যে, শিশুটি তার তাকদীরের লিখন—অর্থাৎ সে দুর্ভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান—তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই বক্তব্যটি তাঁদের প্রথম বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ শিশুটি জন্মায় কলুষমুক্ত অবস্থায়, কিন্তু আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে সে কুফরি করবে কি না। আর সংরক্ষিত ফলকে (লাওহে মাহফুজ) তার জন্য যা লেখা হয়েছে, তা তাকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। ঠিক যেমন একটি পশু সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আল্লাহ জানেন যে সেটি পরবর্তীতে বিকলাঙ্গ হবে কি না। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীর মর্মার্থও এটিই:

إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

"খিজির (আলাইহিস সালাম) যে কিশোরকে হত্যা করেছিলেন, তাকে সৃষ্টির দিনই 'কাফির' হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিল; এবং সে যদি বেঁচে থাকত, তবে সে তার পিতামাতাকে বিদ্রোহ ও কুফরির মাধ্যমে কষ্ট দিত।"[৮৪]

এর অর্থ হলো—আল্লাহ 'উম্মুল কিতাব' বা মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফুজ) তার সম্পর্কে এই ফয়সালা করে রেখেছিলেন যে, সে যদি বড় হতো তবে সে কাফির হতো। মুশরিকদের যেসব

---

[৮৩] সহীহ মুসলিম, ২৮৬৫।

[৮৪] সহীহ মুসলিম, ২৬৬১।

সন্তান ছোটবেলায় মারা যায়, তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন:

اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

"তারা বড় হলে কী আমল করত, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।"[৮৫]

অর্থাৎ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মুমিন হতো এবং কে কাফির হতো যদি তারা বয়ঃসন্ধি বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ اللهَ يَمْتَحِنُهُمْ وَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ أَجَابَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করবেন এবং হাশরের ময়দানে তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠাবেন। যারা সেই রাসূলের আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যারা তাঁর অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৮৬]

এই পর্যায়ে এসে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আগে থেকে যা জানতেন, তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাদের থেকে যা প্রকাশ পাবে (অর্থাৎ তাদের কর্ম), তার ভিত্তিতেই তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন। এই বিষয়টি কেবল আল্লাহর ইলম বা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং তাদের প্রকাশ্য বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে হবে। মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে এটিই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এবং এই মতের সপক্ষে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

সত্যের সাথে মানুষের এই সহজাত সম্পর্কের তুলনা হলো সূর্যের সাথে চোখের জ্যোতির সম্পর্কের মতো। যার চোখ আছে, তাকে যদি কোনো বাধা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে অবশ্যই সূর্যকে দেখতে পাবে। ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং অগ্নিপূজক ধর্মের মতো কলুষিত মতাদর্শগুলো হলো সেই বাধার মতো যা চোখ ও সূর্যের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়।

---

[৮৫] সহীহ মুসলিম, ২৬৬০।

[৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৪।

একইভাবে, যার রুচিবোধ সঠিক আছে সে অবশ্যই মিষ্টতাকে পছন্দ করবে; তবে তার প্রকৃতি যদি কলুষিত ও পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তার মুখে মিষ্টিও তেতো লাগবে।

শিশু ফিতরাতের ওপর জন্ম নেওয়ার অর্থ এই নয় যে—সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ই ইসলামী আকিদা মনে পোষণ করে জন্ম নেয়; কারণ আল্লাহ মানুষকে তার মায়ের গর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে সে কিছুই জানত না। বরং মানুষ জন্ম নেয় একটি কলুষমুক্ত হৃদয় নিয়ে, যা সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত এবং ইসলামের সত্যতাকে পেতে উন্মুখ—এমনভাবে যে, তাকে যদি তার প্রকৃতি পরিবর্তন করার মতো কেউ না থাকত, তবে সে অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবেই বড় হতো। এটি হলো জ্ঞান ও কর্মের এমন এক সুপ্ত শক্তি যা কোনো বাধা না থাকলে অবধারিতভাবে ইসলামকেই গ্রহণ করে নেয়। এটিই সেই স্বভাবজাত প্রকৃতি (ফিতরাত), যার ওপর আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটির প্রসঙ্গে বলা যায়:

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

“সেই ব্যক্তিই দুর্ভাগা, যে তার মায়ের গর্ভেই দুর্ভাগা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।”[৮৭]

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِ بِغَيْرِهِ.

“প্রকৃত দুর্ভাগা সেই, যে তার মায়ের গর্ভেই দুর্ভাগা হিসেবে লিপিভুক্ত হয়েছে; আর সৌভাগ্যবান সেই, যে অন্যের (অবস্থা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।”[৮৮]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.

---

[৮৭] সহীহ মুসলিম, ২৬৪৫।

[৮৮] সহীহ মুসলিম, ২৬৪৫।

"তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য আকারে জমা থাকে, অতঃপর তা সমপরিমাণ সময়ের জন্য জমাট রক্তে পরিণত হয়, তারপর সমপরিমাণ সময়ের জন্য তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান যাকে চারটি বিষয় লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়; তাকে বলা হয়: 'তার আমল (কর্ম), তার রিযিক, তার আয়ু এবং সে কি দুর্ভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান—তা লিখে দাও।' এরপর তার মধ্যে রূহ বা প্রাণ ফুঁকে দেওয়া হয়।"[৮৯]

এটি প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ তাঁর চিরন্তন জ্ঞান—যা তাঁর অন্যতম গুণাবলি—দ্বারা জানেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে দুর্ভাগা এবং কে সৌভাগ্যবান ও মুক্তিপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ এটি 'লাওহে মাহফুজে' (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন শিশুর (তাকদীরের) অবস্থা লিখে নিতে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই চিরন্তন জ্ঞানকে অস্বীকার করে, সে কাফির।

আর পশু-পাখিদের ব্যাপারে কথা হলো—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সকলকেই পুনরায় জীবিত করবেন। এটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا طٰٓئِرٍ یَّطِیۡرُ بِجَنَاحَیۡهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمۡثَالُکُمۡ ؕ مَا فَرَّطۡنَا فِی الۡکِتٰبِ مِنۡ شَیۡءٍ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمۡ یُحۡشَرُوۡنَ ﴿۳۸﴾

"আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। এ কিতাবে আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রব-এর দিকে একত্র করা হবে।"[৯০]

এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

وَ اِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۵﴾

"আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে,"[৯১]

---

[৮৯] সহীহ বুখারী, ৩২০৮ এবং সহীহ মুসলিম, ২৬৪৩।

[৯০] সূরা আল-আনআম, ৬:৩৮।

[৯১] সূরা আত-তাকভীর, ৮১:৫।

এবং মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَثَّ فِیۡهِمَا مِنۡ دَآبَّۃٍ ؕ وَ هُوَ عَلٰی جَمۡعِهِمۡ اِذَا یَشَآءُ قَدِیۡرٌ ﴿۲۹﴾

"আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো; আর তিনি যখন ইচ্ছে তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।"[৯২]

এখানে আরবি শব্দ **"ইজা" 'إذا' 'যখন'** এমন ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা অনিবার্য বা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোও সর্বজনবিদিত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم ، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء ، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة الأخرى قال الله : كونوا ترابا ، فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً.

"আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগত—জিন, মানুষ এবং পশুদের মধ্যে বিচার করবেন। সেদিন শিংবিহীন পশুর পক্ষ থেকে শিংওয়ালা পশুর ওপর করা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে (অর্থাৎ তাদের হিসাব চুকিয়ে দেওয়া হবে), যতক্ষণ না কোনো অমীমাংসিত বিষয় বাকি থাকে। অতঃপর আল্লাহ (পশুদের উদ্দেশ্যে) বলবেন, 'তোমরা মাটি হয়ে যাও!' আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাফিররা বলবে, 'হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হতাম!'"[৯৩]

যারা বলে যে পশুদের পুনরায় জীবিত করা হবে না, তারা ভুল করছে; এবং এটি জঘন্যতম ভুলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। বরং যে ব্যক্তি দাবি করে যে পশুদের পুনরুত্থান হবে না, সে একজন পথভ্রষ্ট এবং আল্লাহর বাণীর অস্বীকারকারী। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি শিশু ফিতরাত বা স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ মানুষের অন্তরকে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রিয় বা কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যেই সে প্রকৃত প্রশান্তি খুঁজে পায় না। প্রতিবার যখন সে কোনো কিছুকে ভালোবাসে, সে অনুভব করে যে তার অন্তর অন্য কিছুর

---

[৯২] সূরা আশ-শূরা, ৪২:২৯।

[৯৩] সিলসিলাহ আস-সহীহাহ, ১৯৬৬; শায়খ আল-আলবানী এটিকে বিশুদ্ধ (সহীহ) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সন্ধান করছে, এমন কাউকে খুঁজছে যাকে সে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।"[৯৪]

---

[৯৪] সূরা আর-রা'দ, ১৩:২৮।

কবরে শিশুদের পরীক্ষা

শায়খ ফাওজান: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "শিশুরা যখন মারা যায়, তখন কি কবরে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়?"

ইবনে তাইমিয়্যাহ: শিশুরা মারা গেলে তাদের কি কবরে পরীক্ষা করা হয়? মুনকার ও নকীর কি তাদের প্রশ্ন করেন? ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য আলেমদের এই বিষয়ে দুটি মত রয়েছে।

প্রথম মত: শিশুদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না; বরং এই পরীক্ষা কেবল তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে শরীয়তের বিধান পালনের উপযুক্ত বা প্রাপ্তবয়স্ক (মুকাল্লাফ) ছিল। এটি আল-কাজী আবু ইয়ালা[৯৫] এবং ইবনে আকীল[৯৬] -এর অভিমত।

দ্বিতীয় মত: শিশুদের কবরে পরীক্ষা করা হবে। ইমাম শাফিয়ী এবং অন্যান্যদের কোনো কোনো অনুসারী থেকে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি শিশুর জানাজার নামাজ পড়ালেন এবং বললেন:

اللَّهُمَّ قه عَذَابِ الْقَبْرِ وفتنة الْقَبْر

'হে আল্লাহ, আপনি একে কবরের আজাব ও কবরের পরীক্ষা থেকে রক্ষা করুন'।"[৯৭]

এই বক্তব্যটি সেইসব আলেমদের মতের সাথে সংগতিপূর্ণ যারা বলেন যে, শিশুদের পরকালে পরীক্ষা করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তারা জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। এটি আহলুস সুন্নাহ ও হাদিস বিশারদ অধিকাংশ আলেমের অবস্থান।

---

[৯৫] তিনি হলেন প্রখ্যাত আলেম আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল ফাররা, যিনি হিজরি ৩৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

[৯৬] তিনি হলেন প্রখ্যাত আলেম ইবনে আকীল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, যিনি হিজরি ৬৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

[৯৭] আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ এটি আস-সুন্নাহ গ্রন্থে (১৪১৯) বর্ণনা করেছেন।

ঈমানদারদের সন্তানদের রূহ অন্যান্য মুমিনদের রূহের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও তাদের স্তরের ভিন্নতা থাকবে। জান্নাতে শিশুদের মর্যাদা নির্ভর করবে তাদের পিতামাতার নেক আমল এবং তাদের নিজস্ব ভালো কাজের (যদি থাকে) ওপর। সে অনুযায়ী, নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুত্র ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদা অন্য শিশুদের মতো নয়। ছোট শিশুরা যে ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান তারা পাবে, যদিও এই বয়সে তাদের পাপ লিপিবদ্ধ করা থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ তাদের কোনো গুনাহ হবে না)। জনৈক নারী তার শিশুকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন:

أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

“এর জন্য কি হজ আছে? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে এর সওয়াব’।”[৯৮]

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

“তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তাদের সালাত বা নামাজের নির্দেশ দাও। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে, তখন (সালাত না পড়লে) তাদের প্রহার করো এবং তাদের শোয়ার বিছানা আলাদা করে দাও।”[৯৯]

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে শিশুরা আশুরার দিন এবং অন্যান্য দিনে রোজা রাখত।

শিশুরা তাদের সালাত, রোজা, হজ এবং অন্যান্য নেক আমলের জন্য সওয়াব লাভ করবে। যে শিশু ভালো কাজ করে, সে ওই শিশুর তুলনায় বেশি মর্যাদাবান হবে—যে তার মতো নেক আমল করে না। এছাড়া পিতামাতার সম্মানে শিশুটি যে অতিরিক্ত সওয়াব বা মর্যাদা লাভ করবে, তা তো আছেই। এটি অনেকটা দুনিয়ার জীবনের মতো—যে শিশু তার পিতামাতার উপার্জনের মাধ্যমে উপকৃত হয়, সে ওই শিশুর চেয়ে বেশি সচ্ছল থাকে যার পিতামাতার তেমন

[৯৮] সহীহ মুসলিম, ১৩৩৬।

[৯৯] সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৫।

কোনো উপার্জন নেই। মুমিনদের রূহ বা আত্মাগুলো জান্নাতে অবস্থান করে, যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

"মুমিনের রূহ হলো একটি পাখি, যা জান্নাতের গাছে বসে (ফলমূল খায়); যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন আল্লাহ একে তার দেহে ফিরিয়ে দেন।"[১০০]

এর অর্থ হলো—তারা জান্নাতের খাবার গ্রহণ করবে। আর রূহ বা আত্মা যে সৃষ্ট (অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছে), সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও রূহের অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হয়ে যায় না, তবে এর মৃত্যু বলতে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বোঝায়। যখন দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন রূহগুলো তাদের নিজ নিজ দেহে ফিরে আসবে। জান্নাতবাসীরা তাদের আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের উচ্চতা হবে ৬০ হাত, যা অনেকগুলো বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا.

"যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা প্রত্যেকেই আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আকৃতি লাভ করবে; আর তাঁর উচ্চতা ছিল ৬০ হাত।"[১০১]

কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের সেবক হবে। কিন্তু এই বক্তব্যের কোনো (সহীহ) ভিত্তি নেই। বরং এটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে:

وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ.

"জান্নাতে কিছু অতিরিক্ত জায়গা খালি থেকে যাবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য নতুন এক সৃষ্টি তৈরি করেন এবং তাদের সেই খালি জায়গায় বসবাস করতে দেন।"[১০২]

---

[১০০] মুয়াত্তা মালিক, ৫৭২; হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) এই বর্ণনার সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

[১০১] সহীহ মুসলিম, ২৮৪১।

[১০২] সহীহ বুখারী, ৬৯৪৯।

যদি আল্লাহ নতুন এক সৃষ্টি তৈরি করেন—যারা আদম-সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নয়—জান্নাতের অতিরিক্ত জায়গায় বসবাস করার জন্য; তবে আদম-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মর্যাদা কেমন হবে? তারা কি সেই নতুন সৃষ্টির চেয়ে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য বেশি যোগ্য নয়, যাদের কেবল জান্নাতের খালি জায়গা পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেখানে রাখা হয়েছে?

আর মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রসঙ্গে—

وَ اِنۡ مِّنۡكُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا

"আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে।"[১০৩]

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের একটি হাদিসে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ـ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ ـ نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ.

"তাদের প্রত্যেককে—মুনাফিক হোক বা মুমিন—নিজ নিজ নূর বা আলো দেওয়া হবে, অতঃপর তারা সেই আলো অনুসরণ করবে। জাহান্নামের ওপর অবস্থিত সেই পুলের (সিরাত) ওপর থাকবে কাঁটা ও আংটা, যা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে পাকড়াও করবে। এরপর মুনাফিকদের আলো নিভে যাবে এবং মুমিনরা মুক্তি পাবে।"[১০৪]

'সিরাত' হলো জাহান্নামের ওপর স্থাপিত একটি সেতু। জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেককেই এই সিরাত অতিক্রম করতে হবে—তারা দুনিয়াতে শিশু অবস্থায় মারা যাক কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে। আর জান্নাতবাসীদের সেবায় নিয়োজিত যে কিশোররা তাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করবে[১০৫], তারা জান্নাতবাসীদের সেবার জন্যই জান্নাতে সৃজিত এক বিশেষ সৃষ্টি; তারা এই দুনিয়ার কোনো সন্তান নয়। পক্ষান্তরে, এই দুনিয়ার যেসব শিশু জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের

---

[১০৩] সূরা মারইয়াম, ১৯:৭১।

[১০৪] সহীহ মুসলিম, ১৯১।

[১০৫] **অনুবাদকের নোট:** "তাদের সেবায় ঘুরাঘুরি করবে চিরকিশোরেরা; তুমি যখন তাদের দেখবে, মনে করবে তারা যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তো।" (সূরা আল-ইনসান, ৭৬:১৯)

গঠন অন্য জান্নাতবাসীদের মতোই পূর্ণাঙ্গ করা হবে এবং তারা তাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আকৃতি লাভ করবে। তাদের বয়স হবে ৩৩ বছর এবং উচ্চতা হবে ৬০ হাত। বর্ণিত আছে যে, জান্নাতবাসীদের দেহের প্রস্থ হবে সাত হাত।[১০৬] আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

কবরে শিশুদের প্রশ্ন করা হবে। এটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেছেন:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِينَةً قَطَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

“আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর পেছনে এমন এক শিশুর জানাজার নামাজ পড়েছি, যে কখনো কোনো পাপ করেনি। আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি– ‘হে আল্লাহ, আপনি একে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করুন’।”[১০৭]

এটি একটি প্রমাণ যে, শিশুদের কবরে পরীক্ষার (সওয়াল-জওয়াব) সম্মুখীন হতে হবে। এর ওপর ভিত্তি করেই বলা যায়, কাফিরদের যেসব সন্তান শরীয়তের বিধান পালনের বয়সে (প্রাপ্তবয়স্ক) পৌঁছানোর আগেই মারা গেছে, পরকালে তারা জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে।

অবশ্য কোনো কোনো আলেম কাফিরদের সন্তানদের পরকালীন পরিণতির বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেননি (অর্থাৎ তারা বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন)। যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুশরিকদের সেসব সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যারা ছোটবেলায় মারা যায়, তখন তিনি বলেছিলেন:

اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

“তারা বড় হলে কী আমল করত, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।”[১০৮]

---

[১০৬] জামে আত-তিরমিযী, ২৫৪৫।

[১০৭] মুয়াত্তা মালিক, ৫৪০।

[১০৮] সহীহ মুসলিম, ২৬৬০।

সহীহ বুখারীতে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের (কাফিরদের সন্তানদের) মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০৯] আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبِعَ يَوْمَ طَبِعَ كَافِرًا.

"খিজির (আলাইহিস সালাম) যে কিশোরকে হত্যা করেছিলেন, তাকে সৃষ্টির দিনই 'কাফির' হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিল।"[১১০]

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যেমন সফল ও দুর্ভাগা রয়েছে, শিশুদের মধ্যেও তেমনি কেউ সফল হবে এবং কেউ দুর্ভাগা হবে। যদি এটি দুনিয়াতে তাদের জন্য একটি পরীক্ষা হয়ে থাকে, তবে কবরে তাদের পরীক্ষা হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

শায়খ ফাওজান: সংক্ষেপে, বয়ঃসন্ধির আগে মারা যাওয়া শিশুদের বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রথম মতটি হলো—কবরে এবং কিয়ামতের দিন তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। দ্বিতীয় মতটি হলো—তাদের পরিণতির বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান না নিয়ে নীরব থাকা। উভয় পক্ষই এই বিষয়ে একমত যে, আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম ধরে সে জান্নাতবাসী হবে বলে সাক্ষ্য দিতে পারি না (যতক্ষণ না এ বিষয়ে কোনো অকাট্য দলিল পাওয়া যায়); যদিও আমরা সাধারণভাবে সাক্ষ্য দেই যে, মুমিনদের সন্তানরা জান্নাতে থাকবে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কোনো কোনো হাদিস বিশারদ আলেম বলেন যে, কাফিরদের সন্তানরা যারা ছোটবেলায় মারা গেছে, তারা সবাই জাহান্নামী হবে। আবার অন্য আলেমদের মতে, বয়ঃসন্ধির আগে মারা যাওয়া কাফিরদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে। তারা দলিল হিসেবে সেই হাদিসটি পেশ করেন যেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বপ্নে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে মুমিনদের সন্তানদের সাথে দেখেছিলেন; তখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আর মুশরিকদের সন্তানদের কী হবে?" তিনি বলেছিলেন, "মুশরিকদের সন্তানরাও (তার সাথেই ছিল)।[১১১]

---

[১০৯] সহীহ বুখারী, ৭০৪৭।

[১১০] সহীহ মুসলিম, ২৩৮০।

[১১১] সহীহ বুখারী, ৬৬৪০।

তবে সঠিক অবস্থান হলো এটি বলা যে—আল্লাহই ভালো জানেন তারা বড় হলে কী আমল করত। কোনো অকাট্য দলিল (নস) ছাড়া আমরা নির্দিষ্ট করে কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলতে পারি না। এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যেখানে উল্লেখ আছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের যারা আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যারা অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে। কিয়ামতের দিন তাদের পরীক্ষা করা হবে, ঠিক যেমন কবরে তাদের পরীক্ষা করা হবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, "তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে?"

মহান আল্লাহ বলেছেন:

يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَنۡ سَاقٍ وَّ يُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ﴿۴۲﴾

"স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না;"[১১২]

কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হবে সে দুনিয়াতে যার ইবাদত করত তার অনুসরণ করতে। ফলে কাফিররা তাদের উপাস্যদের অনুসরণ করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যতক্ষণ না কেবল মুসলিম ও মুনাফিকরা অবশিষ্ট থাকে।[১১৩] তখন আল্লাহ তাদের কাছে তাঁর 'নলা' (পা) উন্মোচিত করবেন; ফলে মুনাফিকরা ছাড়া বাকি সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। মুনাফিকদের পিঠের হাড় তখন একটি শক্ত হাড়ের মতো হয়ে যাবে, যা তারা বাঁকাতে (সিজদা করতে) পারবে না।

---

[১১২] সূরা আল-কলম, ৬৮:৪২।

[১১৩] সহীহ বুখারী, ৪৫৮১।

জান্নাতের শিশুরা কি শিশু হিসেবেই থাকবে?

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে—জান্নাতবাসীরা কি সেখানে সন্তান জন্মদান করবে? জান্নাতের সেই কিশোররা কি জান্নাতবাসীদেরই সন্তান? আর মুমিন ও কাফিরের রূহ যখন দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তখন সেগুলোর কী হয়?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সকল প্রশংসা আল্লাহর। জান্নাতবাসীদের সেবায় নিয়োজিত যে কিশোররা তাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করবে, তারা জান্নাতেই সৃজিত এক বিশেষ সৃষ্টি; তারা মানুষের সন্তান নয়। পক্ষান্তরে, এই দুনিয়ার যেসব মানুষ শিশু অবস্থায় মারা গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের গঠন অন্য জান্নাতবাসীদের মতোই পূর্ণাঙ্গ করা হবে এবং তারা তাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আকৃতি লাভ করবে। তাদের বয়স হবে ৩৩ বছর এবং উচ্চতা হবে ৬০ হাত। একইভাবে বর্ণিত আছে যে, তাদের দেহের প্রস্থ হবে সাত হাত।

মুমিনদের রূহ জান্নাতে এবং কাফিরদের রূহ জাহান্নামে অবস্থান করে। মুমিনদের রূহ জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করবে আর কাফিরদের রূহ আজাব ভোগ করতে থাকবে। রূহগুলো পুনরায় তাদের দেহে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকবে।

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—যেসব মুসলিম শিশু ছোটবেলায় মারা গেছে, তারা কি জান্নাতে বড় হবে এবং বিয়ে করবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সকল প্রশংসা আল্লাহর। তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই তাদের আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে। তাদের উচ্চতা হবে ৬০ হাত এবং প্রস্থ হবে সাত হাত। প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই তারা সেখানে বিয়ে করবে। এমনকি দুনিয়াতে যদি কোনো মুমিন নারী অবিবাহিত থাকে, পরকালে তাকেও বিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষরাও বিয়ে করবে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শায়খ ফাওজান: শায়খকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া (জারজ) শিশু কি জান্নাতে প্রবেশ করবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: জেনার (ব্যভিচার) মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশু যদি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তা না করে, তবে সে

তার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। পরকালের প্রতিদান আমল বা কাজের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, বংশমর্যাদার ওপর নয়। অবৈধ সন্তানকে কেবল এই আশঙ্কায় মন্দ ভাবা হয় যে, সেও হয়তো (তার বাবা-মায়ের মতো) অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে পারে—যেমনটি প্রায়ই ঘটে থাকে। একইভাবে উচ্চবংশীয়দের প্রশংসা করা হয় এই ধারণায় যে তারা হয়তো নেক আমল করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কর্মের জন্যই প্রতিদান পাবে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী বা পরহেযগার।

খিজির ও ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) কি অমর?

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—খিজির ও ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) কি অমর বা চিরঞ্জীব?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: তাঁরা বর্তমানে জীবিত নন এবং তাঁরা অমরও নন। ইব্রাহিম আল-হারবি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে খিজির ও ইলিয়াসের অমরত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কিছু মানুষ বলে তাঁরা জীবিত এবং তাঁরা মানুষের কাছে হাদিস বর্ণনা করেন, আবার মানুষও তাঁদের থেকে হাদিস বর্ণনা করে; এ বিষয়ে আপনার মত কী?" ইমাম আহমাদ উত্তর দিয়েছিলেন, "যারা বর্তমানে বিদ্যমান নেই এমন কারো থেকে কেউ কিছু বর্ণনা করলে তা গ্রহণ করা হবে না; আর যারা তাঁদের সাথে দেখা হওয়ার দাবি করে, তারা আসলে শয়তানের দেখা পেয়েছে।"

ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—খিজির ও ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) কি এখনো জীবিত? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তাঁরা কীভাবে জীবিত থাকতে পারেন? এটি কীভাবে সত্য হতে পারে যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

'আজ থেকে একশ বছর পর পৃথিবীর বুকে বর্তমানে যারা আছে তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না।'[১১৪]

ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ مَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ الۡخُلۡدَ ؕ اَفَا۠ئِنۡ مِّتَّ فَهُمُ الۡخٰلِدُوۡنَ ﴿۳۴﴾

"আর আমরা আপনার আগেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; কাজেই আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে?"[১১৫]

---

[১১৪] সহীহ বুখারী, ১১৬।

[১১৫] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩৪।

সুতরাং তাঁরা জীবিত নন। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহর প্রতি যারা এই মতটি আরোপ করেন যে—তিনি নাকি খিজির (আলাইহিস সালাম)-কে জীবিত মনে করতেন—এই উত্তরটি তাদের সেই দাবি খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং, হয় এই বক্তব্যটি ভুলভাবে তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে, অথবা তিনি পরবর্তীকালে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। অতএব, এটি স্পষ্ট যে খিজির (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যান্য মানুষের মতোই তাঁর মৃত্যু হয়েছে—দলিলসমূহ এটিই প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ

"আর আমরা আপনার আগেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি;"[১১৬]

খিজির (আলাইহিস সালাম) এখনো বেঁচে আছেন—এই দাবির সপক্ষে কোনো বিশুদ্ধ (সহীহ) দলিল নেই। খিজির এবং অন্য সকল মানুষ যে মৃত্যুবরণ করেন, এই বিশুদ্ধ দলিলটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক; যাতে নির্বোধ প্রতারক ও ভণ্ডরা মানুষের আকিদা নষ্ট করার জন্য কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে না পারে। তারা স্পষ্ট দলিল বর্জন করে এমন সব সংশয় বা ধারণার আশ্রয় নেয় যেগুলোর সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। এটি কুপ্রবৃত্তি পূজারীদের পদ্ধতি; তারা মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল বিষয়কে আঁকড়ে ধরে এবং বিশুদ্ধ দলিল বর্জন করে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই।

[১১৬] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩৪।

কবরে নবীদের অবস্থা

শায়খ ফাওজান: শায়খ তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে তাইমিয়্যাহকে সেই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে যে—নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর কবরে নামাজরত অবস্থায় দেখেছেন[১১৭], আবার তাঁকে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করতে দেখেছেন এবং আসমানসমূহেও[১১৮] অন্যান্য নবীদের দেখেছেন। প্রশ্ন হলো—মানুষ মারা যাওয়ার পর কি সে কোনো আমল বা কাজ করতে সক্ষম? মৃত্যু হলে আমল বন্ধ হয়ে যায়—এই বর্ণনার সাথে এর সামঞ্জস্য কী? মূসা (আলাইহিস সালাম) কি তাঁর মৃত্যুর পর এই নামাজ ও তাওয়াফ দ্বারা কোনো সওয়াব বা উপকার লাভ করেন? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি অন্যান্য নবীদের তাঁদের জাগতিক শরীরে দেখেছিলেন নাকি তাঁদের রূহ বা আত্মা দেখেছিলেন?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর। মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করতে দেখার বিষয়টি ছিল একটি স্বপ্ন; এটি মেরাজের রাতের ঘটনা নয়। একইভাবে তিনি স্বপ্নে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং দাজ্জালকেও কাবার চারপাশে তাওয়াফ করতে দেখেছিলেন। তবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেরাজের রাতে অন্যান্য নবীদের দেখেছিলেন। তিনি প্রথম আসমানে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে, দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে, চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)-কে, পঞ্চম আসমানে হারুন (আলাইহিস সালাম)-কে, ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে এবং সপ্তম আসমানে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে দেখেছিলেন (বা এর বিপরীত ক্রমে)। তিনি যখন আসমানসমূহে নবীদের দেখেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের রূহসমূহকে তাঁদের দেহের আকৃতিতে দেখেছিলেন। তবে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর বিষয়টি ব্যতিক্রম, তিনি তাঁর দেহ

---

[১১৭] নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং তিনি তাঁর কবরে নামাজ পড়ছিলেন।" (সুনানে নাসায়ী, ১৬৩৩)

[১১৮] **অনুবাদকের নোট:** এখানে 'আসমান' বলতে জান্নাতকে বোঝানো হয়নি। বরং এটি পৃথিবীর উপরে অবস্থিত সেই আসমানসমূহকে নির্দেশ করে, যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন— "তোমরা কি লক্ষ্য করো না আল্লাহ কীভাবে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে?" (সূরা নূহ, ৭১:১৫)

ও রূহসহ আসমানে আরোহণ করেছেন; ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। আর ইব্রাহিম, মূসা এবং অন্যান্য নবীদের কথা হলো—তাঁরা পৃথিবীতেই সমাহিত রয়েছেন।

মসীহ (ঈসা আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসবেন; তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন। বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহে যেমনটি এসেছে—তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন এবং শূকর নিধন করবেন। এই কারণেই ঈসা (আলাইহিস সালাম) দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন—যদিও তিনি ইউসুফ, ইদ্রিস ও হারুন (আলাইহিস সালাম)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কারণ কিয়ামতের আগে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, যা অন্য নবীদের ক্ষেত্রে ঘটবে না।

আদম (আলাইহিস সালাম) প্রথম আসমানে (নিকটতম আসমান) রয়েছেন যাতে তাঁর বংশধরদের রূহগুলো তাঁর সামনে পেশ করা হয়; যাদের মধ্যে রয়েছে জান্নাতী সৌভাগ্যবান আত্মা এবং জাহান্নামী দুর্ভাগা আত্মা। দুর্ভাগাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।[১১৯] অতএব, যখন এই আত্মাগুলো তাঁর সামনে পেশ করা হয়, তখন আদম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটতম আসমানে থাকাটাই আবশ্যক।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেছেন, আবার তাকে জান্নাতেও দেখেছেন—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ রূহ বা আত্মার কাজ অনেকটা ফেরেশতাদের কাজের মতো। ফেরেশতাদের মতোই আত্মা চোখের পলকে উর্ধ্বারোহণ করতে পারে এবং নিচে নেমে আসতে পারে। আত্মা কখনোই শরীরের মতো (স্থবির বা সীমাবদ্ধ) নয়।

কবরে তাঁর নামাজ পড়ার বিষয়টি মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য এক প্রকার প্রশান্তি ও আনন্দ লাভের মাধ্যম; যেমন জান্নাতবাসীরা 'সুবহানাল্লাহ' বলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করবে। দুনিয়ার

[১১৯] "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সেগুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উট সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।" (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৪০)

মানুষ যেভাবে অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, জান্নাতবাসীরা ঠিক সেভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে। ফলত, কবরে তাঁর এই নামাজ পড়া কোনো ‘শরীয়তি দায়িত্ব’ (religious responsibility) নয় যার মাধ্যমে অতিরিক্ত সওয়াব হাসিল করা উদ্দেশ্য; বরং এটি একটি ইবাদত যার মাধ্যমে আত্মা পরম সুখ ও তৃপ্তি লাভ করে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ছাড়া বাকি সব আমল বন্ধ হয়ে যায়: সদকায়ে জারিয়া, কল্যাণকর জ্ঞান এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”[১২০]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বক্তব্যের মাধ্যমে এমন কাজের কথা বুঝিয়েছেন যার মাধ্যমে মানুষ সওয়াব অর্জন করে; তিনি কাজের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়া বোঝাননি। জান্নাতবাসীরা আল্লাহর দিদার বা দর্শন লাভের মাধ্যমে চরম সুখ লাভ করবে এবং তারা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরম আনন্দ উপভোগ করবে।

কুরআনের হাফেজকে (জান্নাতে) বলা হবে,

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

“তুমি তিলাওয়াত করতে থাকো এবং ওপরে আরোহণ করো; আর ঠিক সেভাবেই তারতীবের সাথে (ধীরে সুস্থে ও সুমধুর স্বরে) তিলাওয়াত করো, যেভাবে তুমি দুনিয়াতে করতে। কারণ তোমার মর্যাদা বা জান্নাতের স্তর হবে ঠিক সেখানেই, যেখানে তোমার তিলাওয়াত শেষ হবে।”[১২১]

জান্নাতবাসীরা তাদের রবের সাথে কথোপকথন এবং তাঁর গুণগান করার মাধ্যমে পরম তৃপ্তি লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনে এসব কাজ করলে সওয়াব পাওয়া যায়; কিন্তু পরকালে জান্নাতবাসীদের কাছে এই ইবাদতগুলো তাদের পানাহার বা দাম্পত্য সম্পর্কের চেয়েও বেশি আনন্দদায়ক হবে। অথচ এগুলোর প্রতিটিই হলো নেক আমল। দুনিয়াতে আমাদের পানাহার এবং দাম্পত্য সম্পর্কের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আর যদি কারো নিয়ত ভালো থাকে, তবে সে

---

[১২০] সুনানে নাসায়ী, ৩৬৫১।

[১২১] জামে আত-তিরমিযী, ২৯১৪।

এসব কাজের জন্যও সওয়াব লাভ করে। কিন্তু পরকালে সেই কাজগুলোই—যা দুনিয়াতে ইবাদত ছিল—পরম উপভোগ ও আনন্দের বিষয়ে পরিণত হবে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

যেসব মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে এমন একজন মুসলিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—যে এমন কিছু নেক আমল করে যার বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরি হয় এবং গাছ রোপণ করা হয়; কিন্তু এরপর সে এমন সব গুনাহ করে যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সে যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে, তবে জান্নাতে তার জন্য নির্ধারিত সেই বাসস্থানের কী হবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সে যদি যথাযথভাবে তওবা করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে তার জন্য যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সে বঞ্চিত হবে না; বরং সে তার প্রাপ্য লাভ করবে। আর যদি সে তওবা না করে, তবে তার নেক আমল ও গুনাহসমূহ একে অপরের বিপরীতে ওজন করা হবে। যদি তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হয়, তবে সে পুরস্কারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তার গুনাহের পাল্লা নেক আমলের চেয়ে ভারী হয়ে যায়, তবে সে শাস্তিপাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমতাবস্থায়, তার মন্দ কাজগুলো—যা তার নেক আমলের ওপর প্রবল হয়েছে—জান্নাতের সেই প্রতিশ্রুতিকে মুছে দেবে। একইভাবে, কেউ যদি জাহান্নামে যাওয়ার মতো গুনাহ করার পর পুনরায় নেক আমল করে, তবে সেই নেক আমল তার গুনাহগুলোকে মুছে দেবে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে কবীরা গুনাহ (বড় পাপ) অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মুসলিমদের জন্য সুপারিশ (শাফায়াত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এই মুসলিমরা কি শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমদের পক্ষে শাফায়াত সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো অসংখ্য এবং এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম, পরবর্তী তাবেয়ীগণ ও ইসলামের ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন। কেবল বিদআতী গোষ্ঠীগুলোই—যেমন খারেজী, মুতাজিলা ও তাদের অনুসারীরা—এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না; বরং যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমান থাকা অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে কিছু খালি জায়গা অবশিষ্ট থাকবে; তাই আল্লাহ নতুন এক সৃষ্টি তৈরি করবেন এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) কি তার ইসলাম অবস্থায় করা আমলের সওয়াব পাবে?

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ইসলাম ত্যাগ করেছে (মুরতাদ হয়েছে)। সে ইসলামে থাকাকালীন যে নেক আমলগুলো করেছিল, সেগুলোর জন্য কি সে সওয়াব পাবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়—সে মুশরিক হোক বা আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান)—যদি সে এই কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আলেমদের ঐক্যমতে (ইজমা) তার পূর্বের সকল আমল বাতিল বা নিস্ফল হয়ে যাবে। এটি কুরআনের অকাট্য দলিলের ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত। আল্লাহ কুরআনের একাধিক স্থানে আমাদের এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ مَنۡ یَّرۡتَدِدۡ مِنۡکُمۡ عَنۡ دِیۡنِهٖ فَیَمُتۡ وَ هُوَ کَافِرٌ فَاُولٰٓئِکَ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَۃِ ۚ

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে।"[১২২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

وَ مَنۡ یَّکۡفُرۡ بِالۡاِیۡمَانِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهٗ

"আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে।"[১২৩]

এবং তাঁর বাণী:

وَ لَوۡ اَشۡرَکُوۡا لَحَبِطَ عَنۡهُمۡ مَّا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ

---

[১২২] সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১৭।

[১২৩] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৫।

“আর যদি তারা শির্ক করত তবে তাঁদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।”[১২৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে:

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

“যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”[১২৫]

তবে আলেমদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে নিয়ে মতভেদ রয়েছে—যে মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছে। তার মুরতাদ হওয়ার আগের আমলগুলো কি বাতিল হয়ে যাবে, নাকি আমল বাতিল হওয়ার বিষয়টি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে? ইমাম আহমাদের মাযহাবে উভয় মতই পাওয়া যায়—অর্থাৎ আমল বাতিল হয়ে যাওয়া এবং বাতিল না হওয়া। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মাযহাব মতে, মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথেই আমল বাতিল হয়ে যায়। ইমাম শাফিঈর মাযহাবে এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত থাকা হয়েছে (অথবা ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে)।

---

[১২৪] সূরা আল-আনআম, ৬:৮৮।

[১২৫] সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬৫।

কিয়ামতের দিন কি কাফিরদের বিচার করা হবে?

শায়খ ফাওজান: শায়খকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন কাফিরদের হিসাব-নিকাশ বা বিচার করা হবে কি না।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের অনুসারীগণ এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, কাফিরদের কোনো বিচার হবে না; আবার কেউ বলেন, তাদের বিচার করা হবে।

এই আলোচনার সারকথা হলো—'বিচার' বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে? এটি কি তাদের পাপের জন্য তিরস্কার ও শাস্তির উদ্দেশ্যে তাদের আমলগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করা? নাকি বিচার বলতে তাদের নেক আমল ও বদ আমল একে অপরের বিপরীতে ওজন করাকে বোঝানো হচ্ছে? যদি প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য হয়, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের বিচার করা হবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি ধরা হয়—অর্থাৎ কাফিরদের এমন কোনো নেক আমল থাকবে যা তাকে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য করবে—তবে সেই অর্থটি স্পষ্টতই ভুল। বরং এর অর্থ হতে পারে এই যে, কাফিরদের শাস্তির ধরনে তারতম্য হবে। যে কাফিরের পাপ বেশি হবে তার শাস্তি সেই কাফিরের চেয়ে বেশি হবে যার পাপ কম; এবং যার কিছু ভালো কাজ থাকবে তার শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে। এই কারণেই আবু তালিবের শাস্তি আবু লাহাবের শাস্তির চেয়ে কম হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

"যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব;"[১২৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

اِنَّمَا النَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ

[১২৬] সূরা আন-নাহল, ১৬:৮৮।

"কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো শুধু কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করা,"[১২৭]

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সুতরাং, পাপাচার বেশি হওয়া এবং ভালো কাজ কম থাকার কারণে কোনো কোনো কাফির অন্য কাফিরের তুলনায় বেশি কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাদের বিচার করা হবে মূলত তাদের শাস্তির স্তর নির্ধারণ করার জন্য, জান্নাতে প্রবেশের জন্য নয়।

[১২৭] সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩৭।

জ্বিন জাতির বাস্তবতা

শায়খ ফাওজান: শায়খকে জ্বিন জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তারা কি ধর্মের বিধান পালনে বাধ্য? জ্বিনদের মধ্যেও কি কেউ পুণ্যবান আর কেউ পাপাচারী রয়েছে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কুরআন, সুন্নাহ এবং আরও অনেক প্রমাণের মাধ্যমে জ্বিনদের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। অনেক মানুষ জ্বিন দেখেছে। আবার অনেকে এমন মানুষের দেখা পেয়েছে যারা জ্বিন দেখেছে এবং সেই সংবাদগুলো যাচাইকৃত। কেউ কেউ জ্বিনদের সাথে কথা বলেছে, আবার জ্বিনরাও মানুষের সাথে কথা বলে। কিছু মানুষ জ্বিনদের ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। আবার কিছু মানুষ তাদের সাথে অন্যভাবেও মেলামেশা করে। এটি নেককার এবং পাপাচারী—উভয় ধরনের মানুষের মাধ্যমেই ঘটে থাকে।

জ্বিনদেরকেও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধর্মের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জ্বিন ও মানুষের শারীরিক গঠন এবং সীমানা এক নয়; তবে তারা উভয়ই ইসলামের শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে অংশীদার। জ্বিন ও মানুষ—উভয়কেই আদেশসমূহ পালন করতে হবে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতভেদ জানা নেই।

একইভাবে, এ বিষয়েও কোনো দ্বিমত নেই যে—যেসব জ্বিন কুফরি ও পাপাচার করবে, তারা মানুষের মতোই জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হবে। মতভেদ কেবল মুমিন জ্বিনদের নিয়ে। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ (রহ.)-এর অনুসারীগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফ[১২৮] ও ইমাম মুহাম্মদ[১২৯] -এর ঐক্যমতে—মুমিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাবারানী কর্তৃক সংগৃহীত একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي رِيضِ الْجَنَّةِ ، يَرَاهُمُ الْإِنْسُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُمْ.

---

[১২৮] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আল-আনসারী, ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি হিজরি **১৮১** সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১২৯] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, ইমাম আবু হানিফার ছাত্র। তিনি হিজরি **১৮৯** সালে মৃত্যুবরণ করেন।

"নিশ্চয়ই তারা (জ্বিনরা) জান্নাতের উপকণ্ঠে থাকবে। মানুষ তাদের দেখতে পাবে, কিন্তু জ্বিনরা মানুষকে দেখতে পাবে না।"[১৩০]

অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-সহ একদল আলেমের মতে, আনুগত্যশীল জ্বিনরা পশুর মতো মাটিতে (ধুলায়) পরিণত হবে। আর তাদের আনুগত্যের পুরস্কার হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া।

জ্বিনদের মধ্য থেকে কি কোনো রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, নাকি কেবল সতর্ককারী ও উপদেশদাতারাই ছিল? এ বিষয়ে দুটি ভিন্ন মত রয়েছে। যারা জ্বিনদের মধ্য থেকে রাসূল হওয়ার পক্ষে মত দেন, তারা এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেন:

يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ رُسُلٌ مِّنۡكُمۡ

"হে জিন ও মানুষের দল! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের কাছে আসেনি?"[১৩১]

অন্য মতটি হলো—রাসূলগণ কেবল মানবজাতির মধ্য থেকেই প্রেরিত হন; আর জ্বিনদের মধ্যে রয়েছেন কেবল উপদেষ্টা ও সতর্ককারীগণ। এই মতটিই অধিক প্রচলিত। জ্বিনগণ মূলত রাসূলের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত দ্বীন অনুসরণ করে।

وَلَّوۡا اِلٰی قَوۡمِهِمۡ مُّنۡذِرِيۡنَ ﴿۲۹﴾ قَالُوۡا يٰقَوۡمَنَاۤ اِنَّا سَمِعۡنَا كِتٰبًا اُنۡزِلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مُوۡسٰی

"তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে,"[১৩২]

আর মহান আল্লাহর সেই বাণীর প্রসঙ্গে— **"তোমাদের মধ্য থেকেই কি তোমাদের কাছে রাসূলগণ আসেনি?"**—এটি অনেকটা তাঁর এই বাণীর মতো:

يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا اللُّؤۡلُؤُ وَ الۡمَرۡجَانُ ﴿۲۲﴾

---

[১৩০] ইবনে কাসীরের তাফসীর দ্রষ্টব্য, সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩১।

[১৩১] সূরা আল-আনআম, ৬:১৩০।

[১৩২] সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:২৯-৩০।

"উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।"[১৩৩]

এখানে তিনি মিষ্টি পানি ও লোনা পানি—উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন, যদিও মুক্তা ও প্রবাল কেবল লোনা পানি থেকেই উৎপন্ন হয়। (অর্থাৎ এখানে 'উভয়' বলতে সামগ্রিকতাকে বোঝানো হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় রাসূলগণ সামগ্রিকভাবে তোমাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ মানুষ ও জ্বিনদের জন্য পাঠানো হয়েছে, যদিও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কেবল মানুষ ছিলেন)।

জ্বিনরা ধর্মের বিধান পালনে বাধ্য কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এর সপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন:

أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتِ مَعَهُ فَقَرَأْتِ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ فَانْطَلَقُوا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ : لَكُمْ كُلُّ عَظَمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَ عُ فِي أَيْدِكُمْ أَوْفَرُ مَا يَكُونُ وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٍ لِدَوَاتِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ.

"জ্বিনদের পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী আমার কাছে এসেছিল; আমি তার সাথে গেলাম এবং তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করলাম।" বর্ণনাকারী বলেন, "আমরা তাঁর সাথে গেলাম এবং তিনি আমাদের তাদের পদচিহ্ন ও তাদের আগুনের অবশিষ্টাংশ দেখালেন। তারা (জ্বিনরা) তাঁর (নবীজি) কাছে তাদের খাবারের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেছিলেন—'প্রত্যেক সেই হাড় যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা তোমাদের খাবার। সেটি যখন তোমাদের হাতে পড়বে, তখন তা মাংসে পূর্ণ হয়ে যাবে; আর (উটের) গোবর হলো তোমাদের পশুপাখির খাদ্য'।" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন, "সুতরাং তোমরা শৌচকার্য বা পরিচ্ছন্নতার কাজে এগুলো ব্যবহার করো না।"[১৩৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা জ্বিনদের খাবার এবং তাদের পশুপাখির খাদ্যের ক্ষতি না করি। এটি প্রমাণ করে যে, কেবল সেই হাড়গুলোই তাদের জন্য বৈধ যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে; আর অন্য হাড়গুলো (অর্থাৎ আল্লাহর নাম ছাড়া যবেহ করা পশুর হাড়) তাদের জন্য বৈধ নয়।

---

[১৩৩] সূরা আর-রাহমান, ৫৫:২২।

[১৩৪] সহীহ মুসলিম, ৪৫০।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ اِذۡ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَکُمُ الۡیَوۡمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّیۡ جَارٌ لَّکُمۡ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الۡفِئَتٰنِ نَکَصَ عَلٰی عَقِبَیۡهِ وَ قَالَ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّنۡکُمۡ اِنِّیۡۤ اَرٰی مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۴۸﴾

"আর স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলীকে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয় অর্জনকারী নেই, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশে অবস্থানকারী। অতঃপর দু দল যখন পরস্পর দৃশ্যমান হল তখন সে পিছনে সরে পড়ল এবং বলল, নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১৩৫]

এটি আমাদের অবহিত করে যে, শয়তান আল্লাহকে ভয় পায়; আর (তার এই) শাস্তি মূলত আল্লাহর আদেশ অমান্য করা এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণেই অবধারিত হয়েছে।

ইবলিস—যে হলো জ্বিন জাতির পিতা—তার পাপ কিন্তু (আল্লাহর অস্তিত্বকে) অস্বীকার করা ছিল না। আল্লাহ তাকে আদমের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিল যে এটি আল্লাহরই নির্দেশ। আর তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো বার্তাবাহক বা রাসূল ছিলেন না যাকে সে অস্বীকার করতে পারত (বরং সে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছিল)। কিন্তু যখন সে আদমের প্রতি সিজদা করতে অস্বীকার করল, তখন আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করলেন। এই কারণেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّار.

"আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা দেয়, শয়তান তখন একাকী হয়ে কাঁদতে থাকে। সে বলে, 'হায় দুর্ভোগ আমার! আদম সন্তানকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; ফলে সে সিজদা করল এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত হলো। আর

---

[১৩৫] সূরা আল-আনফাল, ৮:৪৮।

আমাকেও সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, তাই আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম'।"[১৩৬]

মহান আল্লাহ সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনীতে বলেছেন:

وَ لِسُلَيۡمٰنَ الرِّيۡحَ غُدُوُّهَا شَهۡرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهۡرٌ ۚ وَ اَسَلۡنَا لَهٗ عَيۡنَ الۡقِطۡرِ ؕ وَ مِنَ الۡجِنِّ مَنۡ يَّعۡمَلُ بَيۡنَ يَدَيۡهِ بِاِذۡنِ رَبِّهٖ ؕ وَ مَنۡ يَّزِغۡ مِنۡهُمۡ عَنۡ اَمۡرِنَا نُذِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ السَّعِيۡرِ ﴿۱۲﴾

"আমি সুলাইমানের জন্য বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যার সকালের পথ চলা ছিল এক মাসের (পথ) এবং বিকেলের পথ চলা ছিল এক মাসের (পথ)। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম এবং কিছু জ্বিন তার সামনে কাজ করত তার রবের নির্দেশে; আর তাদের মধ্যে যে কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করত, তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির স্বাদ আস্বাদন করাতাম।"[১৩৭]

এখানে আল্লাহ সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি জ্বিনদের আনুগত্যকে তাঁর নিজেরই নির্দেশ হিসেবে গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে ইবলিস অবাধ্যতা করেছিল; তিনি এটি বলেননি যে সে (আল্লাহর বাণীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। আল্লাহ আমাদের সেই জ্বিনদের সম্পর্কেও জানিয়েছেন যারা (কুরআন শোনার পর) তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে ফিরে গিয়েছিল।

قَالُوۡا يٰقَوۡمَنَاۤ اِنَّا سَمِعۡنَا كِتٰبًا اُنۡزِلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مُوۡسٰى

"তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে,"[১৩৮]

আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত:

وَ مَنۡ لَّا يُجِبۡ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيۡسَ بِمُعۡجِزٍ فِي الۡاَرۡضِ

---

[১৩৬] সহীহ মুসলিম, ৮১।

[১৩৭] সূরা সাবা, ৩৪:১২।

[১৩৮] সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩০।

“আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে যমীনে আল্লাহকে অপারগকারী নয়।”[১৩৯]

আল্লাহ তাআলা জ্বিনদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহর আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দেয়; আর এই আহ্বানকারী হলেন স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ‘সাড়া দেওয়া’র অর্থ হলো—তাঁর আদেশ পালন করা এবং যা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন তা বর্জন করা। আর এটাই হলো সেই ইবাদত যার জন্য আল্লাহ মানবজাতি ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

“আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।”[১৪০]

যারা বলে যে—’ইবাদত’ বলতে কেবল তাদের ভেতরের সহজাত বা জন্মগত জ্ঞানকে বোঝায় এবং এটিকেই ঈমান হিসেবে গণ্য করা হয় যা জ্বিন ও মানুষের মাঝে বিদ্যমান—তাদের এই দাবি ভুল। যদি বিষয়টি এমনই হতো, তবে জ্বিন ও মানুষের মধ্যে কোনো কাফির বা অবিশ্বাসী থাকত না। অথচ আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে ইবলিস কুফরি করেছে, ঠিক যেমন জ্বিন ও মানুষের মধ্যে আরও অনেকেই কুফরি করেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

“অবশ্যই আমি জ্বিন ও মানুষ—উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।”[১৪১]

তিনি আমাদের অবহিত করেছেন যে, তিনি ইবলিস এবং যারা তার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, কেবল যারা তার অনুসরণ করবে তারাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর মাধ্যমে এটিও জানা গেল যে, কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে, তারা সবাই ইবলিসের অনুসারী। কাফিররা মুমিন নয়; এবং আল্লাহর

---

[১৩৯] সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩২।

[১৪০] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬।

[১৪১] সূরা হুদ, ১১:১১৯।

অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের যে জ্ঞান রয়েছে, তা তাদের মুমিন বানায় না (যদি না তারা তাঁর আদেশ পালন করে)।

এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে—জ্বিনরা হজ করে, নামাজ পড়ে, জিহাদ করে এবং তাদের কৃতপাপের জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। মহান আল্লাহ জ্বিনদের বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন:

وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿۱۱﴾

"এবং আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু সংখ্যক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;"[১৪২]

জ্বিনদের মধ্যেও বিভিন্ন দল ও মতাদর্শ রয়েছে; যেমন—মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি, শিয়া এবং সুন্নি। তাদের মধ্যে কেউ অত্যন্ত নেককার, আবার কেউ নেককারদের তুলনায় নিম্নস্তরের।

শায়খ ফাওজান: আমাদের সময়ে এমন কিছু মানুষ আছে যারা জ্বিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; কারণ তারা তাদের স্থূল বুদ্ধি এবং সংকীর্ণ দূরদর্শিতার ওপর নির্ভর করে। তারা অদৃশ্যে (গায়েব) বিশ্বাস করে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জ্বিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কুফরি এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুতি (মুরতাদ হওয়া); কারণ সে আল্লাহর বাণী, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ এবং মুসলমানদের ঐক্যমতকে (ইজমা) প্রত্যাখ্যান করছে। কুরআন ও সুন্নাহতে জ্বিনদের কথা বারবার এসেছে। আলেমগণ সবাই জ্বিনদের অস্তিত্বের ব্যাপারে একমত। বর্তমান যুগের কিছু বইয়ে জ্বিনদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হলেও, মানুষের ওপর জ্বিন সওয়ার হওয়া বা মানুষের দেহে তাদের প্রবেশ করাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটি একটি ভ্রষ্টতা এবং সুস্পষ্ট ভুল; কারণ সহীহ দলিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য দ্বারা এটি প্রমাণিত যে—জ্বিন মানুষকে আছর করে বা মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। একজন মুসলমানের জন্য এটিই কর্তব্য যে, সে তার নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তার ওপর নির্ভর না করে বিশুদ্ধ দলিলসমূহের সামনে আত্মসমর্পণ করবে। কারণ কেবল বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলে সে এমন অনেক কিছু অস্বীকার করে বসবে যা প্রমাণিত এবং প্রত্যক্ষ সত্য। আর সকল সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

---

[১৪২] সূরা আল-জ্বিন, ৭২:১১।

শয়তানের প্রতারণা

শায়খ ফাওজান: কবর জিয়ারতের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ সেইসব অনিষ্ট সম্পর্কে কথা বলেছেন যা পথভ্রষ্টদের হাতে ঘটে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছে। তারা দাবি করে যে মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসে এবং যারা জিয়ারত করতে যায় তাদের অভিবাদন জানায়। কিন্তু বাস্তবে শয়তান সেই মৃত ব্যক্তির রূপ ধারণ করে তাদের সাথে কথা বলে যাতে তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: এ প্রসঙ্গে এমন অনেক মানুষ আছে যারা দেখে যে কাবা শরিফ তাদের চারপাশ দিয়ে ঘুরছে, অথবা তারা একটি বিশাল আরশ দেখে যার ওপর এক বিশাল অবয়ব বসে আছে। তারা দেখে যে কিছু লোক ওপরে উঠছে এবং নিচে নামছে; তারা বিশ্বাস করে যে এরা হলো ফেরেশতা। তারা আরশের ওপরের সেই প্রতিচ্ছবিকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে। অথচ আল্লাহ এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে। বাস্তবে তারা যা দেখছে তা হলো শয়তান।

এই জাতীয় গল্প অনেকের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষিত থাকেন, ফলে তারা চিনতে পারেন যে এগুলো শয়তান। যেমন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী[১৪৩] তাঁর বিখ্যাত এক ঘটনায় বলেছেন— "একদিন আমি ইবাদত করছিলাম, তখন পানির ওপর একটি বিশাল আরশ দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো, 'হে আব্দুল কাদের, আমি তোমার রব। অন্যের জন্য যা হারাম করেছি, তোমার জন্য তা হালাল করে দিলাম।' আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি সেই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই?! দূর হও আল্লাহর শত্রু!' তৎক্ষণাৎ সেই নূর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে অন্ধকারে পরিণত হলো। সে (শয়তান) বলল, 'হে আব্দুল কাদের, তুমি তোমার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কারণে বেঁচে গেলে; আমি এর মাধ্যমে সত্তরজন মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে (পথভ্রষ্ট করে) দিয়েছিলাম'।" আব্দুল কাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কীভাবে জানলেন যে ওটি শয়তান ছিল?" তিনি বললেন, "আমি তখনই

---

[১৪৩] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন শায়খ আব্দুল কাদের আল-জিলানী। শায়খ ফাওজান তাঁর সম্পর্কে বলেছেন— "শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী সূফি ছিলেন না। তিনি ছিলেন হাম্বলি ফিকহের আলেমদের মধ্যে একজন মহান ইমাম। কাদিরিয়া তরীকার লোকেরা তাঁর প্রতি যা আরোপ করে তা মিথ্যা এবং সেটি তাঁর মানহাজ বা আদর্শ ছিল না।"

বুঝতে পেরেছিলাম যখন সে আমাকে বলল— 'আমি তোমার জন্য তা হালাল করেছি যা অন্যদের জন্য হারাম করেছি।' কারণ আমি জানতাম যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরিয়ত কখনোই রহিত বা পরিবর্তিত হবে না। আমি আরও জানতাম যখন সে বলেছিল 'আমি তোমার রব', কারণ সে এটি বলার ক্ষমতা রাখে না যে— 'আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই'।" এই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করে ফেলে যে তারা যা দেখছে তা-ই আল্লাহ। ফলে তাদের সঙ্গীরাও এটি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে দেখেছে। তারা বুঝতে পারে না যে তারা শয়তানের দিকে তাকিয়ে আছে। এটি মূর্খ ইবাদতকারীদের অনেক দলের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের দলের কেউ এই দুনিয়াতে চর্মচক্ষে আল্লাহকে দেখেছে। তাদের অনেকেই যাকে আল্লাহ বলে মনে করে, বাস্তবে তা শয়তান। আবার অনেকেই এমন কাউকে দেখে যাকে তারা নবী, নেককার ব্যক্তি বা খিজির (আলাইহিস সালাম) বলে মনে করে, কিন্তু আসলে সে শয়তান।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ رَأَنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখল; কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।"[১৪৪]

এটি মূলত স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কারণ স্বপ্ন সত্য হতে পারে আবার শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তাই আল্লাহ শয়তানকে নবীর রূপ ধারণ করা থেকে বিরত রেখেছেন। তবে জাগ্রত অবস্থায় কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) যে উল্লেখ করেছেন—স্বপ্নে নবীকে দেখার অর্থই হলো প্রকৃতপক্ষে তাঁকে দেখা, এটি কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা তাঁর প্রকৃত শারীরিক অবয়ব সম্পর্কে অবগত। যারা নবীজির অবয়ব সম্পর্কে জানে না, শয়তান তাদের ধোঁকা দিতে পারে এবং নিজেকে নবী বলে দাবি করতে পারে; ফলে সেই ব্যক্তিও তাকে বিশ্বাস করে বসতে পারে। কারণ ওই ব্যক্তি নবীজির প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জানে না, যা শয়তান কখনোই নকল করতে পারে না।

[১৪৪] সহীহ মুসলিম, ২২৬৬।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কিছু মানুষ মনে করে যে তারা ফেরেশতা দেখছে; অথচ বাস্তবে সেটি শয়তান কোনো রূপ ধারণ করে আছে। ফেরেশতারা বিভিন্নভাবে জ্বিনদের চেয়ে আলাদা। জ্বিনদের মধ্যে কাফির, পাপাচারী ও মূর্খ রয়েছে। আবার কিছু জ্বিন মুমিন যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারী। অনেকে যারা বুঝতে পারে না যে এরা জ্বিন বা শয়তান, তারা এদের ফেরেশতা বলে ভুল করে। শয়তান তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করে যারা শিরক, সীমা লঙ্ঘন এবং পাপের মতো কাজ পছন্দ করে। এর বিনিময়ে শয়তান হয়তো সেই ব্যক্তিকে কিছু গোপন সংবাদ জানিয়ে দেয়। অথবা তারা সেই ব্যক্তির পছন্দের কাউকে হত্যা বা অসুস্থ করার মাধ্যমে ক্ষতি করে। শয়তান হয়তো সেই ব্যক্তির পছন্দের কাউকে তার সামনে এনে হাজির করে। কখনো কখনো তারা সেই ব্যক্তির জন্য সম্পদ, খাবার বা পোশাক চুরি করে নিয়ে আসে। ওই ব্যক্তি মনে করে এটি আল্লাহর অলীদের দেওয়া 'কারামাত' (অলৌকিক ঘটনা); কিন্তু বাস্তবে এগুলো হলো চুরি করা মাল। কখনো কখনো শয়তান কোনো ব্যক্তিকে শূন্যে বহন করে দূর দেশে নিয়ে যায়। তাদের কাউকে কাউকে আরাফাতের দিনের সন্ধ্যায় মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুনরায় বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। তারা মনে করে এটি আল্লাহভীরুতার কারণে প্রাপ্ত অলৌকিক ক্ষমতা; অথচ তারা মুসলমানদের সাথে হজ পালন করেনি, হজের ইহরাম পরেনি, হজের তালবিয়া[১৪৫] পড়েনি, কাবা তাওয়াফ করেনি কিংবা সাফা-মারওয়ায় সায়িও করেনি। এটি নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্টতার একটি চরম পর্যায়।

এই বিষয়ে দীর্ঘ সব কাহিনী রয়েছে; যা মুশরিকদের ক্ষেত্রে ঘটে এবং এই উম্মতের যারা তাদের অনুকরণ করে কিংবা বিদআতী—তাদের ক্ষেত্রেও ঘটে। যারা নিয়মিত মৃত ব্যক্তিদের ডাকে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায় (চাই তিনি নবী হোন বা অন্য কেউ), তাদের এই কাজটিই তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করে, তারা শয়তানদের দেখে যারা সেই ব্যক্তিদের রূপ ধারণ করে থাকে। তারা (শয়তানরা) বলে, "আমি অমুক," এবং তাদের কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে, তারা বিশ্বাস করে যে—যে মৃত ব্যক্তির কাছে তারা সাহায্য চেয়েছিল, তিনিই তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের

---

[১৪৫] **অনুবাদকের নোট:** এটি হজ্জপালনকারীর সেই পাঠ— "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।" (আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোনো শরিক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত এবং রাজত্ব আপনারই; আপনার কোনো শরিক নেই)। এটি সহীহ বুখারী (৫৯১৫) ও সহীহ মুসলিমের (১১৮৪) বর্ণনায় এসেছে।

অনুরোধ পূরণ করেছেন। বাস্তবে তা ছিল কেবল জ্বিন ও শয়তান। কিছু জ্বিন ও শয়তান নিজেকে ফেরেশতা বলে দাবি করবে, কিন্তু ফেরেশতারা কখনোই মুশরিকদের সাহায্য করে না। এটি কেবল শয়তান, যে তাদের সরল পথ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

মূর্খরা শয়তানের সাহায্যে সম্পাদিত এই কাজগুলো দেখে বিভ্রান্ত হয়। তাই তারা এই কাজগুলো যারা করে তাদের অনুগত হয়ে যায় এবং তাদের আল্লাহর অলি (বন্ধু) মনে করে। অথচ তারা জানে যে এই ব্যক্তিরা বাধ্যতামূলক ইবাদতসমূহ—যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ—আদায় করে না। এবং তারা এও জানে যে এই ব্যক্তিরা হারাম কাজ, অশ্লীলতা এবং জুলুমে লিপ্ত। তারা ঈমান ও তাকওয়া থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হতে পারে। আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের (অলিদের) বর্ণনা দিয়ে বলেন:

اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿ۚۖ۶۲﴾ اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ کَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ ﴿ؕ۶۳﴾

“জেনে রাখা আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। জেনে রাখা আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।”[১৪৬]

তারা (সাধারণ মানুষ) এমন কাউকে দেখে যে তাকওয়া এবং ঈমান থেকে অনেক দূরে; কিন্তু যেহেতু সে সাধারণ নিয়মের বাইরে কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ড (feats) প্রদর্শন করে, তাই তারা বিশ্বাস করে বসে যে এগুলো আল্লাহর অলিদের কারামাত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে এমন লোকদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে যারা নামাজও পড়ে না। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ঈমান রাখে না, অথচ বিশ্বাস করে যে তারাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অলি। এই সবকিছুর মূল কারণ হলো—তারা এমন বিষয়কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে যা প্রকৃতপক্ষে কোনো দলিলই নয়। কারণ কেউ আল্লাহর অলি কি না, তার প্রকৃত প্রমাণ হলো তার ঈমান ও তাকওয়ার দৃঢ়তা। অথচ এই লোকগুলো ঈমান ও তাকওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে।

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহ এখানে মুশরিকদের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করেছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জানিয়েছেন।

---

[১৪৬] সূরা ইউনুস, ১০:৬২-৬৩।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: মুশরিকদের বা শিরকের উৎপত্তি মূলত দুই প্রকার: নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায় এবং ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়। নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের শিরকের সূচনা হয়েছিল নেককার লোকদের কবরগুলোকে নির্জনে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে। এরপর তারা সেই নেককার লোকদের মূর্তি তৈরি করে সেগুলোর পূজা শুরু করে। অন্যদিকে, ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের শিরকের উৎস ছিল নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রের পূজা। তারা সবাই মূলত জ্বিনদেরই পূজা করে। শয়তান তাদের সাথে কথা বলে এবং তাদের সাহায্য করে; আর তারা বিশ্বাস করে যে তারা ফেরেশতাদের ইবাদত করছে। কিন্তু বাস্তবে তারা জ্বিনদেরই উপাসনা করছে; কারণ এই জ্বিনরাই তাদের সাহায্য করে এবং তাদের শিরকে সন্তুষ্ট থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ يَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ يَقُوۡلُ لِلۡمَلٰٓئِكَۃِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِيَّاكُمۡ كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَ ﴿۴۰﴾ قَالُوۡا سُبۡحٰنَكَ اَنۡتَ وَلِيُّنَا مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ بَلۡ كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَ الۡجِنَّ ۚ اَكۡثَرُهُمۡ بِهِمۡ مُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۴۱﴾

"আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো ইবাদাত করত জিনদের। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত।"[১৪৭]

ফেরেশতারা শিরকের কাজে লিপ্ত কাউকে কখনোই সাহায্য করেন না—সে জীবিত হোক বা মৃত; এবং তারা শিরকের ওপর সন্তুষ্টও নন। কিন্তু শয়তানরা মানুষকে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে, আর মানুষ তাদের চর্মচক্ষে দেখতে পায়। শয়তান তখন বলতে থাকে, "আমিই ইব্রাহিম, আমিই মসীহ (ঈসা), আমিই মুহাম্মাদ, আমিই খিজির, আমিই আবু বকর, আমিই উমর, আমিই উসমান, আমিই আলী, আমিই অমুক শায়খ!" অথবা কোনো জ্বিন কোনো ব্যক্তির রূপ ধারণ করে মানুষকে বলতে পারে যে, অন্য কোনো জ্বিন হলো একজন নবী; অথচ বাস্তবে তারা সবাই হলো জ্বিন।

জ্বিনরা মানুষের মতোই; তাদের মধ্যে কেউ কাফির, কেউ পাপাচারী, কেউ অবাধ্য, কেউ ইবাদতকারী, আবার কেউ মূর্খ। কোনো কোনো জ্বিন হয়তো বিশেষ কোনো শায়খকে পছন্দ করে, তাই তারা সেই শায়খের রূপ ধারণ করে। তারা মানুষকে বলে, "আমিই অমুক শায়খ।"

---

[১৪৭] সূরা সাবা, ৩৪:৪০-৪১।

সেই ব্যক্তি হয়তো কোনো মরুভূমিতে বিপদে পড়েছে; তখন শয়তান বা জ্বিন তাকে খাবার দেয়, পানি পান করায় অথবা এমন কিছু সংবাদ দেয় যা তার কাছে অজানা ছিল। ফলে ওই ব্যক্তি বিশ্বাস করে বসে যে, এটি সেই মৃত শায়খ—যিনি তার জন্য এসব করছেন। অথবা সে মনে করে এটি কোনো ফেরেশতা যে শায়খের রূপ ধরে এসেছে। অথচ এটি কেবলই একজন জ্বিন, কারণ ফেরেশতারা শিরক, জুলুম বা পাপের কাজে কখনোই সাহায্য করেন না।

ফেরেশতারা কি মৃত্যুবরণ করেন?

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে—ফেরেশতাকুলসহ কি সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন যে, ফেরেশতা এবং খোদ মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাঈলসহ[১৪৮] সমস্ত সৃষ্টিই মৃত্যুবরণ করবে। মুসলিম, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা এই বিষয়ে একমত যে—আল্লাহ এটি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। কেবল অ্যারিস্টটলের অনুসারী দার্শনিক এবং তাদের মতো যারা নিজেদের ইসলামের দিকে সম্বন্ধ করে, তারাই এটি অসম্ভব বলে মনে করে। এছাড়াও সেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যারা তাদের অনুসরণ করে; যেমন—'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ব্রেথেন অফ পিউরিটি' (ইখওয়ানুস সাফা) গ্রন্থের লেখকগণ। তারা দাবি করে যে, ফেরেশতারা মূলত বুদ্ধি (intellect) ও আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাদের মৃত্যু হতে পারে না। বরং তারা ফেরেশতাদের উপাস্য এবং মহাবিশ্বের অধিপতি বলে মনে করে।

অথচ কুরআন এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব আমাদের অবহিত করে যে, ফেরেশতারা অনুগত দাস মাত্র। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

لَنۡ يَّسۡتَنۡكِفَ الۡمَسِيۡحُ اَنۡ يَّكُوۡنَ عَبۡدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الۡمَلٰٓئِكَةُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ يَّسۡتَنۡكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهٖ وَ يَسۡتَكۡبِرۡ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ اِلَيۡهِ جَمِيۡعًا ﴿۱۷۲﴾

"মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না। আর কেউ তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন।"[১৪৯]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

---

[১৪৮] **অনুবাদকের নোট:** যদিও ইবনে তাইমিয়্যাহ এখানে 'আজরাঈল' নামটি উল্লেখ করেছেন, তবে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে কেবল 'মালাকুল মাউত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা বলা হয়েছে।

[১৪৯] সূরা আন-নিসা, ৪:১৭২।

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ بَلۡ عِبَادٌ مُّکۡرَمُوۡنَ ﴿۲۶﴾ لَا یَسۡبِقُوۡنَهٗ بِالۡقَوۡلِ وَ هُمۡ بِاَمۡرِهٖ یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۷﴾ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ وَ لَا یَشۡفَعُوۡنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارۡتَضٰی وَ هُمۡ مِّنۡ خَشۡیَتِهٖ مُشۡفِقُوۡنَ ﴿۲۸﴾

"আর তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।"[১৫০]

এবং তিনি আরও বলেন:

وَ کَمۡ مِّنۡ مَّلَکٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡئًا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ یَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَرۡضٰی ﴿۲۶﴾

"আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহর অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[১৫১]

আল্লাহ তাদের (ফেরেশতাদের) মৃত্যু দিতে এবং পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম; যেমনটি তিনি মানুষ ও জ্বিনদের মৃত্যু দিতে এবং পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡ یَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ یُعِیۡدُهٗ وَ هُوَ اَهۡوَنُ عَلَیۡهِ ؕ

"আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তার জন্য অতি সহজ।"[১৫২]

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَ الْمَلَائِكَةَ مِثْلُ الْغَشْيُ.

"আল্লাহ যখন ওহী বা বাণী প্রদান করেন, তখন ফেরেশতারা নুইয়ে পড়েন (বা লুটিয়ে পড়েন)।"[১৫৩]

---

[১৫০] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৬-২৮।

[১৫১] সূরা আন-নাজম, ৫৩:২৬।

[১৫২] সূরা আর-রূম, ৩০:২৭।

[১৫৩] সুনানে আবু দাউদ, ৪৭৩৮।

অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন:

إِذَا سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ كَلَامَهُ صُعِقُوا.

"ফেরেশতারা যখন তাঁর কথা শোনে, তখন তারা বেহুঁশ হয়ে যায়।"[১৫৪]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ كَجَرِ السّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ فَيُصْعَقُونَ فَإِذَا فُ ع عَنْ قُلُوبِهِمْ أَي أَزِيلَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا الْحَقَّ فَيُنَادُونَ : الْحَقَّ الْحَقِ.

"ফেরেশতারা পাথরের ওপর শিকল টানার শব্দের মতো শব্দ শুনতে পায় এবং বেহুঁশ হয়ে যায়; অতঃপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, 'তোমাদের রব কী বলেছেন?' তারা বলে, 'সত্য বলেছেন'। এরপর তারা ডেকে বলে, 'সত্য, সত্য'।"[১৫৫]

সুতরাং, এই সহীহ হাদিসগুলো যদি ফেরেশতাদের বেহুঁশ হওয়া সম্ভব বলে প্রমাণ করে, তবে তাদের মৃত্যু হওয়াও সম্ভব। কিন্তু দার্শনিকরা বিশ্বাস করে না যে ফেরেশতাদের বেহুঁশ হওয়া বা মৃত্যু হওয়া সম্ভব। এই বেহুঁশ হওয়ার বিষয়টি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে ঘটা ঘটনার মতোই:

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ

"যখন তার রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।"[১৫৬]

কুরআন আমাদের সিঙ্গায় (ট্রাম্পেট) তিনটি ফুঁক দেওয়ার বিষয়ে অবহিত করে। প্রথম ফুঁকটি হলো ভীতিপ্রদ ফুঁক (The blow of terror)। আল্লাহর এই বাণীতে যা উল্লেখ আছে:

وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ

---

১৫৪ সহীহ বুখারী, ৪৮০০।

১৫৫ সুনানে আবু দাউদ, ৪৭৩৮।

১৫৬ সূরা আল-আরাফ, ৭:১৪৩।

"আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনের সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত।"[১৫৭]

অন্যান্য ফুঁকগুলো হবে মৃত্যুর জন্য এবং সৃষ্টিজগতকে পুনরায় জীবিত করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ فَصَعِقَ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ اِلَّا مَنۡ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِیۡهِ اُخۡرٰی فَاِذَا هُمۡ قِیَامٌ یَّنۡظُرُوۡنَ ﴿۶۸﴾

"আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমানসমূহে যারা আছে ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়বে, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছে করেন তারা ছাড়া। তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।"[১৫৮]

যাদেরকে এই মৃত্যু থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে—যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে ("তবে আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া")—এটি মূলত জান্নাতবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যেমন হুরগণ, কারণ জান্নাতে কোনো মৃত্যু নেই। আরও অনেকেই থাকতে পারেন যারা সেই সময় মৃত্যুবরণ করবেন না, তবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রত্যেকের পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَأَجِدُ مُوسَى آخِذًا بِسَاقِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِ هَلْ أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ.

"কিয়ামতের দিন মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে জাগ্রত হব। তখন আমি দেখব মূসা আরশের পায়া ধরে আছেন; আমি জানি না তিনি কি আমার আগেই জাগ্রত হয়েছিলেন নাকি তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আল্লাহ মৃত্যু থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।"[১৫৯]

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সিঙ্গায় চারবার ফুঁক দেওয়া হবে। যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই অবগত না থাকেন যে মূসা (আলাইহিস সালাম) অব্যাহতিপ্রাপ্ত

[১৫৭] সূরা আন-নামল, ২৭:৮৭।

[১৫৮] সূরা আয-জুমার, ৩৯:৬৮।

[১৫৯] সহীহ বুখারী, ২২৮০।

ছিলেন কি না, এবং তাঁকে যদি অব্যাহতিপ্রাপ্ত সবার সম্পর্কে জানানো না হয়ে থাকে—তবে আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। এটি অনেকটা কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় বা সমস্ত নবীদের নাম জানার মতো তথ্য, যা আমাদের জানানো হয়নি। এই জ্ঞান কেবল বিশুদ্ধ দলিলের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) ফেরেশতারা মারা যান কি না—সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন; তবে তিনি এটি স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ তাদের মৃত্যু দিতে অবশ্যই সক্ষম। এটি একজন ইলম অন্বেষণকারীর (ছাত্রের) জন্য একটি উদাহরণ; দলিল ছাড়া কোনো বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া উচিত নয়। তবে ফেরেশতারা মারা যান—এমন কোনো স্পষ্ট দলিল না থাকার অর্থ এই নয় যে তাদের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব; কারণ আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর ফেরেশতারা আল্লাহরই সৃষ্টি, এবং তাঁর ক্ষমতা ও ফয়সালা তাদের ওপর কার্যকর।

ফেরেশতাগণ এবং তাঁদের কার্যাবলি

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে ফেরেশতা এবং তাঁদের ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: আল্লাহ তাআলা সেইসব রক্ষক ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করেছেন যাদেরকে মানুষের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡ یَتَوَفّٰىکُمۡ بِالَّیۡلِ وَ یَعۡلَمُ مَا جَرَحۡتُمۡ بِالنَّهَارِ ثُمَّ یَبۡعَثُکُمۡ فِیۡهِ لِیُقۡضٰۤی اَجَلٌ مُّسَمًّی ۚ ثُمَّ اِلَیۡهِ مَرۡجِعُکُمۡ ثُمَّ یُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۶۰﴾ وَ هُوَ الۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهٖ وَ یُرۡسِلُ عَلَیۡکُمۡ حَفَظَۃً ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءَ اَحَدَکُمُ الۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا وَ هُمۡ لَا یُفَرِّطُوۡنَ ﴿۶۱﴾

“তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদেরকে তিনি আবার জীবিত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা হয়। তারপর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকারী এবং তিনি তোমাদের উপর প্রেরণ করেন হেফাযতকারীদেরকে। অবশেষে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমাদের রাসূল (ফিরিশতা) গণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ক্রটি করে না।”[১৬০]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

سَوَآءٌ مِّنۡکُمۡ مَّنۡ اَسَرَّ الۡقَوۡلَ وَ مَنۡ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفٍۭ بِالَّیۡلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿۱۰﴾ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَ مِنۡ خَلۡفِهٖ یَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ

“তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহর নিকট সমান। আর মানুষের জন্য

[১৬০] সূরা আল-আনআম, ৬:৬০-৬১।

রয়েছে তাঁর সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।"[১৬১]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾ وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

"কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক; আর নিশ্চয় নিয়োজিত আছেন তোমাদের উপর সংরক্ষকদল; সম্মানিত লেখকবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর।"[১৬২]

মহান আল্লাহ বলেন:

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ﴿١﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

"শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার; আর কিসে আপনাকে জানাবে রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কী? উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।"[১৬৩]

এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন:

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

"আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর। যখন তার ডানে ও বামে বসা দু'জন ফেরেশতা পরস্পর (তার আমল লিখার জন্য) গ্রহণ করে; সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।"[১৬৪]

মহান আল্লাহ বলেন:

---

[১৬১] সূরা আর-রাদ, ১৩:১০-১১।

[১৬২] সূরা আল-ইনফিতার, ৮২:৯-১২।

[১৬৩] সূরা আত-তারিক, ৮৬:১-৪।

[১৬৪] সূরা কাফ, ৫০:১৬-১৮।

وَ كُلَّ اِنۡسَانٍ اَلۡزَمۡنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیۡ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخۡرِجُ لَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ كِتٰبًا یَّلۡقٰىهُ مَنۡشُوۡرًا ﴿۱۳﴾ اِقۡرَاۡ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰی بِنَفۡسِكَ الۡیَوۡمَ عَلَیۡكَ حَسِیۡبًا ﴿۱۴﴾

"আর প্রত্যেক মানুষের কাজ আমরা তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট।"[১৬৫]

ফেরেশতারা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকেন; তাঁদের মধ্যে কেউ মানুষের জন্য নিযুক্ত এবং সর্বদা তাদের সাথেই অবস্থান করেন। আবার কিছু ফেরেশতা আছেন যারা দিন ও রাতে পালাবদল করেন এবং তাঁরা ফজর ও আসরের নামাজের সময় একত্রিত হন। আল্লাহ তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—অথচ তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত—তিনি ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা আমার বান্দাদের কী অবস্থায় রেখে এসেছ?" ফেরেশতারা উত্তর দেন, "আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখন তারা নামাজরত ছিল এবং আমরা যখন তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তারা নামাজরত ছিল।"[১৬৬]

এমন কিছু ফেরেশতাও রয়েছেন যারা সেই সব মজলিস বা সমাবেশ খুঁজে বেড়ান যেখানে আল্লাহর জিকির বা আলোচনা করা হয়।

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

"বান্দা যখন কোনো নেক কাজের নিয়ত (ইচ্ছা) করে কিন্তু তা সম্পন্ন করে না, তবুও তার জন্য একটি নেক আমল লেখা হয়।"[১৬৭]

যদি নিয়ত বা ইচ্ছা মানুষের মন ও তার রবের মাঝে একটি গোপন বিষয় হয়, তবে ফেরেশতারা তা কীভাবে দেখতে পান?

---

[১৬৫] সূরা আল-ইসরা, ১৭:১৩-১৪।

[১৬৬] সহীহ বুখারী, ৫৫৫।

[১৬৭] সহীহ মুসলিম, ১৬২।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। এই প্রশ্নের উত্তর সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ[১৬৮] থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি ভালো কাজের নিয়ত করে, তখন ফেরেশতারা একটি সুগন্ধ অনুভব করেন; আর যখন কোনো ব্যক্তি মন্দ কাজের নিয়ত করে, তখন তারা দুর্গন্ধ অনুভব করেন।"

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই মানুষের অন্তরের অবস্থা ফেরেশতাদের দেখানোর ক্ষমতা রাখেন; ঠিক যেভাবে তিনি কোনো কোনো মানুষকে অন্য মানুষের মনের খবর জানার ক্ষমতা দান করেন। সুতরাং, আল্লাহ যদি মাঝে মাঝে কিছু মানুষের অন্তরের খবর অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারেন, তবে মানুষের তদারকিতে নিয়োজিত ফেরেশতাদের সেই জ্ঞান দান করা আল্লাহর জন্য আরও বেশি উপযোগী। বলা হয়ে থাকে যে, "আমি তার ঘাড়ের শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী"—এই আয়াতের অর্থ ফেরেশতাদেরও নির্দেশ করে (অর্থাৎ ফেরেশতারা অত্যন্ত নিকটবর্তী)। আল্লাহ ফেরেশতাদের মানুষের মনের গোপন চিন্তাগুলো জানার ক্ষমতা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন:

إِنَّ لِلشَّيْطَانَ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ ، وَالْمَلَكِ لَمَّةً

"নিশ্চয়ই আদম সন্তানের প্রতি শয়তানের পক্ষ থেকে একটি কুমন্ত্রণা (প্ররোচনা) থাকে; আর ফেরেশতার পক্ষ থেকেও থাকে একটি সুমন্ত্রণা (প্রেরণা)।"[১৬৯]

ফেরেশতার পক্ষ থেকে আসা সেই প্রেরণা হলো সত্যকে গ্রহণ করা এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, যার সাথে রয়েছে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। আর শয়তানের পক্ষ থেকে আসা কুমন্ত্রণা হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মন্দের মাধ্যমে মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

---

[১৬৮] **অনুবাদকের নোট:** তিনি হলেন মহান আলেম আবু মুহাম্মাদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, যিনি হিজরি ১৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১৬৯] ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংকলিত।

“তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন করে সঙ্গী (ক্বারিন) জ্বিন নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার সাথেও; তবে আল্লাহ আমাকে তার ওপর সাহায্য করেছেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করেছে (অথবা অনুগত হয়েছে); ফলে সে আমাকে কেবল ভালো কাজেরই নির্দেশ দেয়’।”[১৭০]

সুতরাং, মানুষের মনে যেসব মন্দ সংকল্প বা কুমন্ত্রণা জাগে তা যদি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে শয়তান অবশ্যই সেইসব মন্দ চিন্তা সম্পর্কে অবগত। ঠিক তেমনি, মানুষের মনে যেসব নেক নিয়ত বা সুচিন্তা জাগে তা যদি ফেরেশতার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে ফেরেশতাও সেইসব ভালো চিন্তা সম্পর্কে অবগত। যদি এই ফেরেশতা (সঙ্গী) মানুষের চিন্তা সম্পর্কে জানেন, তবে মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারাও নিশ্চয়ই তার মনের চিন্তা সম্পর্কে অবগত থাকেন।

[১৭০] সহীহ মুসলিম, ২৮১৪।

পরকাল বা শেষ দিবস

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কবরের পরীক্ষা এবং শান্তি অথবা আজাবের পর বড় কিয়ামত (বিচারের মহাদিবস) সংঘটিত হবে। আত্মাগুলোকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বিচার দিবস শুরু হবে। এটি সেই দিন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখে আমাদের অবহিত করেছেন এবং যে বিষয়ে মুসলিমরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মানুষ তাদের কবর থেকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য উঠে আসবে। তারা কবর থেকে খালি পায়ে, নগ্ন অবস্থায় এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠবে।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে পরকালের ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মূলত মানুষের জন্য তিনটি আবাসস্থল রয়েছে: এই পার্থিব জীবন, বরজখি জীবন (মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জগত) এবং পরকালীন জীবন। প্রতিটি আবাসের জন্য নির্দিষ্ট বিধিবিধান এবং ঘটনাবলি রয়েছে।

তাঁর বক্তব্য—"বড় কিয়ামত"; এর কারণ হলো কিয়ামত দুই প্রকার: ছোট কিয়ামত এবং বড় কিয়ামত। মৃত্যু হলো 'ছোট কিয়ামত'। এটি প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ঘটে যখন তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায় এবং তার আয়ু শেষ হয়। আর 'বড় কিয়ামত' হলো যা সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই সময়ে ঘটবে। একে 'দাঁড়ানোর দিন' (Day of Standing) বলা হয় কারণ মানুষ তাদের কবর থেকে উঠে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে।

তাঁর বক্তব্য—"আত্মাগুলোকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে"; এটি ঘটবে যখন ফেরেশতা ইসরাফিল সিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ فَاِذَا هُمۡ مِّنَ الۡاَجۡدَاثِ اِلٰی رَبِّهِمۡ یَنۡسِلُوۡنَ ﴿۵۱﴾ قَالُوۡا یٰوَیۡلَنَا مَنۡۢ بَعَثَنَا مِنۡ مَّرۡقَدِنَا ٜ
هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحۡمٰنُ وَ صَدَقَ الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۵۲﴾

“আর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে। তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।”[১৭১]

এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন:

ثُمَّ نُفِخَ فِيۡهِ اُخۡرٰى فَاِذَا هُمۡ قِيَامٌ يَّنۡظُرُوۡنَ ﴿٦٨﴾

“তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।”[১৭২]

আত্মাই হলো সেই শক্তি যা মানুষ এবং অন্যান্য সকল প্রাণবান সৃষ্টির জীবন দান করে। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এর প্রকৃত রহস্য জানে না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الرُّوۡحِ ؕ قُلِ الرُّوۡحُ مِنۡ اَمۡرِ رَبِّیۡ وَ مَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿٨٥﴾

“আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, ‘রূহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।”[১৭৩]

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্যে—”এটি সেই দিন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের মুখে আমাদের অবহিত করেছেন এবং যে বিষয়ে মুসলিমরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন”—ইবনে তাইমিয়্যাহ মূলত কুরআন, সুন্নাহ, মুসলিমদের ঐক্যমত (ইজমা), যুক্তি এবং ফিতরাত বা সুস্থ স্বভাবজাত প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই দিন সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন এবং এর সপক্ষে বহু প্রমাণ ও নিদর্শন স্থাপন করেছেন। কুরআনের বহু স্থানে তিনি তাদের (কাফিরদের) খণ্ডন করেছেন যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সর্বশেষ নবী, তাই তিনি বিচার দিবসের এমন সব সূক্ষ্ম বিবরণ নিয়ে এসেছেন যা পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না।

---

[১৭১] সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৫১-৫২।

[১৭২] সূরা আয-জুমার, ৩৯:৬৮।

[১৭৩] সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫।

আমাদের কর্মের প্রতিদান পাওয়ার বিষয়টি যেমন বিবেকবুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়, তেমনি এটি ধর্মীয় টেক্সট বা দলিল দ্বারাও সমর্থিত। আল্লাহ কুরআনে মানুষের বিবেককে এই বিষয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেছেন—এই ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে যে, আল্লাহ মানুষকে যা ইচ্ছা তাই করতে দিয়ে ছেড়ে দেবেন, কিংবা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তাদের সৃষ্টি করবেন, যেখানে কোনো আদেশ-নিষেধ বা প্রতিদান থাকবে না—এটি তাঁর হিকমত (প্রজ্ঞা) ও মহানত্বের শান অনুযায়ী হতে পারে না। এটি মোটেও প্রজ্ঞার পরিচয় নয় যে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি এবং একজন পাপাচারী ব্যক্তির পরিণতি একই হবে, কিংবা একজন মুসলিম ও একজন অপরাধীর পরিণতি সমান হবে। অনেক নেককার মানুষ তাদের ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন, আবার অনেক মন্দ লোক তাদের অপরাধের শাস্তি পাওয়ার আগেই মারা যান। সুতরাং, এমন একটি আবাস থাকা অনিবার্য যেখানে প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাবে। যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফির। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ

“কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না।”[১৭৪]

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্য—”মানুষ তাদের কবর থেকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য উঠে আসবে। তারা কবর থেকে খালি পায়ে, নগ্ন অবস্থায় এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠবে”—এর অর্থ হলো সেদিন মানুষের পায়ে কোনো জুতো বা মোজা থাকবে না। তাদের শরীরে কোনো পোশাক থাকবে না এবং তারা হবে খতনাবিহীন (অর্থাৎ জন্মের সময় যেমন ছিল)। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرلاً.

“নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে খালি পায়ে, নগ্ন অবস্থায় এবং খতনাবিহীন অবস্থায়।”[১৭৫]

---

[১৭৪] সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:৭।

[১৭৫] সহীহ আল-বুখারী, ৬৫২৫।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সূর্যকে তাদের অত্যন্ত নিকটে আনা হবে; এবং মানুষ এত অধিক ঘামতে থাকবে যে, সেই ঘাম তাদের মুখে লাগামের মতো (মুখের ওপর পর্যন্ত) পৌঁছে যাবে। (সেদিন) পাল্লা বা মিজান স্থাপন করা হবে এবং বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে।

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۸﴾

"আর সেদিন ওজন যথাযথ হবে। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।"[১৭৬]

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ۚ

"আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।"[১৭৭]

(সেদিন) আমলনামার খাতাগুলো বিলি করা হবে, আর এগুলোই হলো কৃতকর্মের নথিপত্র। কিছু মানুষ তাদের আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করবে, কেউ কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে; আবার কেউ কেউ তাদের আমলনামা পাবে পিঠের পেছন দিক থেকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿۱۴﴾ؕ

"আর প্রত্যেক মানুষের কাজ আমরা তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। আর প্রত্যেক মানুষের কাজ আমরা তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।"[১৭৮]

---

[১৭৬] সূরা আল-আরাফ, ৭:৮।

[১৭৭] সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১০৩।

[১৭৮] সূরা আল-ইসরা, ১৭:১৩-১৪।

আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির বিচার করবেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাকে একান্তে ডেকে নেবেন এবং সেই মুমিন ব্যক্তি তার পাপসমূহ স্বীকার করবে; যেমনটি কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে।[১৭৯]

তবে কাফিরদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ ও মন্দ কাজের তুলনামূলক ওজনের মাধ্যমে বিচার করা হবে না; কারণ (পরকালে প্রতিদান পাওয়ার মতো) তাদের কোনো ভালো কাজই থাকবে না। বরং তাদের মন্দ কাজগুলো গণনা ও তালিকাভুক্ত করা হবে। তাদের সামনে তাদের পাপগুলো উপস্থাপন করা হবে এবং তারা তা স্বীকার করবে; অতঃপর তাদের সেই মন্দ কাজের প্রতিফল দেওয়া হবে।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণিত কিয়ামত দিবসের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কেবল বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়; এটি কেবল নবীজির পক্ষ থেকে আসা বিশুদ্ধ দলিলের মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব। আল্লাহ তাঁর (রাসূলের) সম্পর্কে বলেছেন:

وَ مَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰی ؕ﴿۳﴾ اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی ۙ﴿۴﴾

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়।”[১৮০]

আল্লাহর পূর্ণ হিকমত (প্রজ্ঞা), ন্যায়বিচার এবং রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ হলো—সৃষ্টিজগতকে তাদের কর্মের জন্য পাল্লায় ওজন করা এবং আমলনামা উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচার করা; যদিও আল্লাহ এই সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত এবং তিনি তাঁর বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেখেন। শায়খ এখানে সেই দিনে ঘটতে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্য—”সূর্যকে তাদের অত্যন্ত নিকটে আনা হবে”—এর অর্থ হলো সূর্যকে মানুষের মাথার একদম কাছাকাছি আনা হবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوِ اثْنَيْنِ.

---

[১৭৯] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮৮।

[১৮০] সূরা আন-নাজম, ৫৩:৩-৪।

"কিয়ামতের দিন সূর্যকে বান্দাদের এত কাছে আনা হবে যে, তা মাত্র এক বা দুই মাইল দূরত্বে থাকবে।"[১৮১]

তাঁর বক্তব্য—"মানুষ এত অধিক ঘামতে থাকবে যে, সেই ঘাম তাদের মুখে লাগামের মতো পৌঁছে যাবে"—এর অর্থ হলো ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; ফলে এটি লাগামের মতো কাজ করবে এবং তাদের কথা বলায় বাধা দেবে। সূর্যের প্রচণ্ড নৈকট্যের কারণেই এমনটি ঘটবে। অধিকাংশ সৃষ্টির সাথেই এমনটি ঘটবে, তবে আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করবেন এবং নবীদের মতো যাদের তিনি রক্ষা করতে চাইবেন, তাদের এই অবস্থা থেকে রেহাই দেবেন।

তাঁর বক্তব্য—"পাল্লা (মিজান) স্থাপন করা হবে এবং বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে"—এটি একটি বাস্তব পাল্লা, যার একটি নির্দেশক কাঁটা (tongue) এবং দুটি পাল্লা (pans) থাকবে। এটি পরকালের বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত; তাই দলিলে যেভাবে এসেছে আমরা সেভাবেই বিশ্বাস করি। আমরা দলিলের বাইরে গিয়ে এই পাল্লাটি দেখতে কেমন হবে তা নিয়ে অনুসন্ধান করি না। আমল ওজনের জন্য এই পাল্লা স্থাপনের মূল হিকমত বা প্রজ্ঞা হলো—মানুষের আমলের ওজন প্রদর্শন করা যাতে সেই অনুযায়ী প্রতিদান নিশ্চিত করা যায়।

"সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে"—অর্থাৎ যাদের মন্দ কাজের তুলনায় নেক আমল বেশি হবে; "তারাই হবে সফলকাম।" এর অর্থ হলো তাদের সাফল্য হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া এবং তারা জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে।

"আর যাদের পাল্লা (নেক আমলের) হালকা হবে"—অর্থাৎ যাদের ভালো কাজের চেয়ে মন্দ কাজ বেশি হবে; "তারা সেই সব লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে"—যার অর্থ তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং তারা জাহান্নামে পতিত হবে। "জাহান্নামে তারা স্থায়ী হবে"—অর্থাৎ তারা সেখানেই অবস্থান করবে।

এমন কিছু দলিলও রয়েছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাল্লায় ব্যক্তিকে নিজে, তার আমল এবং তার আমলনামার খাতা—সবই ওজন করা হবে। এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, কারণ এই সবকিছুরই ওজন হতে পারে। তবে ওজনের আসল তুলনা হবে নেক কাজ ও বদ কাজের মধ্যে, ব্যক্তি বা খাতার ওজনের ভিত্তিতে নয়; আর আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[১৮১] জামে আত-তিরমিজি, ২৬০৬।

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্য—"আমলনামার খাতাগুলো বিলি করা হবে, আর এগুলোই হলো কৃতকর্মের নথিপত্র"—এটি সেই কিতাব যেখানে ব্যক্তি দুনিয়াতে যা যা আমল করেছে তা লিপিবদ্ধ আছে। ফেরেশতারা তার কাজগুলো লিখে রেখেছেন এবং ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথেই তার আমলনামাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিচারের সময় এই আমলনামাগুলো খুলে দেওয়া হবে, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি দেখতে পায় সে কী কী করেছে।

তাঁর বক্তব্য—"কিছু মানুষ তাদের আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করবে, কেউ কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে; আবার কেউ কেউ তাদের আমলনামা পাবে পিঠের পেছন দিক থেকে"—এটি ব্যাখ্যা করে যে প্রত্যেকে কীভাবে তাদের কিতাব গ্রহণ করবে। কিছু মানুষ তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে, আর তারা হলো মুমিন। অন্যেরা তাদের আমলনামা বাম হাতে অথবা পিঠের পেছন দিক থেকে পাবে; তারা হলো কাফির। কারণ কাফিরের বাম হাত তার পিঠের পেছনে বাঁধা থাকবে এবং ডান হাত তার ঘাড়ের সাথে আটকে দেওয়া হবে; ফলে সে তার বাম হাত দিয়ে আমলনামা গ্রহণ করবে যা তার পিঠের পেছনে থাকবে।

শায়খ এখানে উল্লেখ করেছেন যে হিসাব-নিকাশ হবে দুই ধরনের। প্রথমটি হলো মুমিনের হিসাব। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির বিচার করবেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাকে একান্তে ডেকে নেবেন এবং সেই মুমিন ব্যক্তি তার পাপসমূহ স্বীকার করবে; যেমনটি কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে।" মহান আল্লাহ বলেন:

فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ کِتٰبَهٗ بِیَمِیۡنِهٖ ۙ﴿۷﴾ فَسَوۡفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیۡرًا ۙ﴿۸﴾ وَّ یَنۡقَلِبُ اِلٰۤی اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا ؕ﴿۹﴾

"অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। তার হিসেব-নিকেশ সহজেই নেয়া হবে। এবং সে তার স্বজনদের কাছে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।"[১৮২]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أُغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ.

---

[১৮২] সূরা আল-ইনশিকাক, ৮৪:৭-৯।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনকে তাঁর খুব কাছে নিয়ে আসবেন এবং তাঁকে তাঁর পর্দা দিয়ে ঢেকে দেবেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘তুমি কি তোমার অমুক অমুক পাপের কথা স্বীকার করো?’ সে বলবে, ‘হ্যাঁ, হে আমার রব’। আল্লাহ তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন যতক্ষণ না সে তার সব পাপ স্বীকার করে নেবে এবং মনে করবে যে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, ‘আমি দুনিয়াতে তোমার এই পাপগুলো গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি সেগুলো তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি’। এরপর তাকে তার নেক আমলের কিতাবটি দেওয়া হবে।”[১৮৩]

কিছু মুমিন কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবেন; যেমন সেই সত্তর হাজার ব্যক্তির ক্ষেত্র হবে যারা কোনো হিসাব বা শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

হিসাব-নিকাশ একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হবে। কারও হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ, কাউকে কেবল তার পাপসমূহ দেখানো হবে এবং পেশ করা হবে; আবার কাউকে তার পাপের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ".

“কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেওয়া হবে, সেই ধ্বংস হবে। আমি (আয়েশা) বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি বলেননি—অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, অচিরেই তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে?’ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘এটি তো কেবল (আমলনামা) পেশ করা মাত্র। তবে কিয়ামতের দিন যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তলব করা হবে, সে নিশ্চিতভাবে আজাবে পড়বে’।”[১৮৪]

দ্বিতীয় প্রকারের হিসাব হলো—কাফিরদের হিসাব। তিনি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) বিষয়টি তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন: “তবে কাফিরদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ ও মন্দ কাজের

---

[১৮৩] সহীহ আল-বুখারী, ২৪৪১।

[১৮৪] সহীহ আল-বুখারী, ৬৫৩৭।

তুলনামূলক ওজনের মাধ্যমে বিচার করা হবে না; কারণ তাদের কোনো ভালো কাজই থাকবে না।" এর অর্থ হলো, কাফিরদের এমন কোনো নেক আমল থাকবে না যা তাদের বদ আমলের বিপরীতে ওজন করা যায়; কারণ তাদের কুফর বা অবিশ্বাসের কারণে তাদের সমস্ত ভালো কাজ বাতিল হয়ে গেছে। ফলে পরকালে তাদের জন্য কেবল পাপসমূহ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্য—"বরং তাদের মন্দ কাজগুলো গণনা ও তালিকাভুক্ত করা হবে। তাদের সামনে তাদের পাপগুলো উপস্থাপন করা হবে এবং তারা তা স্বীকার করবে; অতঃপর তাদের সেই মন্দ কাজের প্রতিফল দেওয়া হবে।" মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۵۰﴾

"অতএব, আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।"[১৮৫]

এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন:

وَ شَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

"এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয় তারা কাফের ছিল।"[১৮৬]

এবং তিনি বলেন:

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۱﴾

"অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!"[১৮৭]

ইবনে তাইমিয়্যাহ: কিয়ামত দিবসের ঘটনাবলির মধ্যে নবীর 'হাওজ' (পানির আধার) উপস্থাপন করা হবে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আকাশে যত

---

[১৮৫] সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৫০।

[১৮৬] সূরা আল-আরাফ, ৭:৩৭।

[১৮৭] সূরা আল-মুলক, ৬৭:১১।

তারা আছে, এতে তার চেয়েও বেশি পেয়ালা রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং এর প্রস্থও এক মাসের পথ। যে ব্যক্তি এখান থেকে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনোই তৃষ্ণার্ত হবে না।

শায়খ ফাওজান: কিয়ামত দিবসের ঘটনাবলির মধ্যে একটি হলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'হাওজ'। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, "হাওজ সম্পর্কিত হাদিসগুলো ৪০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশ সহীহ আল-বুখারীতে রয়েছে।"

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

"আমার হাওজ হলো এক মাসের পথের দূরত্ব। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, এর সুঘ্রাণ কস্তুরীর চেয়েও উত্তম এবং এর পানপাত্রগুলো আকাশের তারকারাজির মতো অসংখ্য; যে এখান থেকে পান করবে সে আর কখনোই তৃষ্ণার্ত হবে না।"[১৮৮]

ইবনে তাইমিয়্যাহ: জাহান্নামের ঠিক ওপর দিয়ে 'সিরাত' স্থাপন করা হবে; এটি হলো জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যকার সেতু। মানুষ তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী এই সেতু পার হবে। কিছু মানুষ চোখের পলকে এটি পার হয়ে যাবে। কেউ কেউ পার হবে বিজলীর (বিদ্যুৎ) গতিতে। কেউ পার হবে বাতাসের বেগে। কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে পার হবে। কেউ উটের আরোহীর মতো পার হবে; কেউ পার হবে দৌড়ে, আবার কেউ হেঁটে। কিছু মানুষ এই সেতু হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে; আবার কাউকে (জাহান্নামের কাঁটা দ্বারা) ছোঁ মেরে ধরা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেতুর দুই পাশে এমন সব কাঁটা থাকবে যা মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোঁ মেরে ধরে ফেলবে।

শায়খ ফাওজান: কিয়ামত দিবসের অন্যতম ঘটনা হলো 'সিরাত' পার হওয়া। আক্ষরিক অর্থে সিরাত মানে প্রশস্ত রাস্তা। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) যা ব্যাখ্যা করেছেন—এটি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার একটি সেতু, যা জাহান্নামের পিঠের ওপর স্থাপন করা হবে।

---

[১৮৮] সহীহ আল-বুখারী, ৬৫৭৯।

তাঁর বক্তব্য—"মানুষ তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী এই সেতু পার হবে"; হাশরের ময়দানে জমায়েত ও হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পর এই সিরাত পার হওয়ার সময় আসবে। মুমিনরা এই সেতুর ওপর দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামিরা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

এরপর শায়খ ব্যাখ্যা করেছেন মানুষ কীভাবে এটি পার হবে। তিনি বলেছেন, "কেউ চোখের পলকে এটি পার হবে", অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। মানুষ এই পৃথিবীতে তাদের ঈমান ও নেক আমল যতটুকু ছিল, সেই অনুযায়ী এটি পার হবে। একজন ব্যক্তি তার দ্বীনের ওপর কতটুকু অটল ও দৃঢ় ছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই তার পার হওয়ার গতি নির্ধারিত হবে। যে ব্যক্তি 'আধ্যাত্মিক সিরাত' অর্থাৎ ইসলামের ওপর দৃঢ় ছিল, সে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত 'ভৌত সিরাত' বা সেতুর ওপরও দৃঢ় থাকবে। আর যে দুনিয়াতে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে সেখানেও পিছলে যাবে।

তাঁর বক্তব্য—"কিছু মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে", অর্থাৎ সে পায়ের বদলে তার নিতম্বে ভর দিয়ে টেনে টেনে পার হবে।

"সেতুর দুই পাশে এমন সব কাঁটা থাকবে যা মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোঁ মেরে ধরবে"—এই কাঁটাগুলো হবে লোহার; যা মানুষকে দ্রুত আঁকড়ে ধরবে। দুনিয়াতে যারা কুপ্রবৃত্তি ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সিরাতাল মুস্তাকিম বা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, সেই মন্দ আমল অনুযায়ী এই কাঁটাগুলো তাদের ছোঁ মারবে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: যারা সিরাত পার হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে জান্নাতে প্রবেশের আগে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে আরও একটি সেতু (ক্বান্তারাহ) রয়েছে। এই সেতুতে মানুষ একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ (পাওনা বা হকের বিচার) গ্রহণ করবে (দুনিয়াতে একে অপরের ওপর যে জুলুম করেছিল তার ভিত্তিতে)। যখন তারা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

শায়খ ফাওজান: "যারা সিরাত পার হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে"—অর্থাৎ যারা জাহান্নামে না পড়ে নিরাপদে পার হতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

"অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম।"[১৮৯]

এবং তিনি আরও বলেন:

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ﴿٧﴾

"একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে।"[১৯০]

তবে জান্নাতে প্রবেশের আগে মুমিনদের পারস্পরিক পাওনা বা হকের বিচার হওয়া আবশ্যক, যাতে তারা সর্বোত্তম অবস্থায় জান্নাতে যেতে পারে। এটি করা হবে তাদের জুলুম থেকে পবিত্র করার জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেন এই সেতুটি সিরাতের শেষ প্রান্ত, আবার কেউ বলেন এটি একটি আলাদা সেতু।

তাঁর বক্তব্য—"এই সেতুতে মানুষ একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে"—দুনিয়াতে যারা মজলুম ছিল তারা জালেমের কাছ থেকে তাদের অধিকার বুঝে নেবে। একবার পবিত্র হয়ে গেলে তারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। তখন তাদের অন্তর থেকে সকল বিদ্বেষ ও ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

وَ نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

"আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে।"[১৯১]

ইবনে তাইমিয়্যাহ: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম ব্যক্তি হবেন যার জন্য জান্নাতের দরজা খোলার অনুমতি চাওয়া হবে। আর তাঁর উম্মত হবে জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম উম্মত। কিয়ামত দিবসে নবীজির তিন ধরনের শাফায়াত (সুপারিশ) থাকবে। **প্রথম শাফায়াত** হলো—হাশরের ময়দানে বিচার কাজ শুরু করার জন্য তিনি সমস্ত সৃষ্টির পক্ষে সুপারিশ করবেন। এটি তখন ঘটবে যখন মানুষ আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসা

---

[১৮৯] সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৮৫।

[১৯০] সূরা আশ-শূরা, ৪২:৭।

[১৯১] সূরা আল-হিজর, ১৫:৪৭।

(আলাইহিস সালাম)-এর কাছে সুপারিশের জন্য গিয়ে ব্যর্থ হবে। **দ্বিতীয় শাফায়াত** হলো—জান্নাতিদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাঁর সুপারিশ। এই দুটি শাফায়াত কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। **তৃতীয় শাফায়াত** হলো—সেইসব মুসলিমদের জন্য যাদের (পাপের কারণে) জাহান্নামে যাওয়ার কথা। এই শাফায়াত নবীজি ছাড়াও অন্যান্য নবী, সিদ্দিক[১৯২] এবং নেককার ব্যক্তিরাও করবেন। তিনি সুপারিশ করবেন যাতে অনেক মুসলিমকে জাহান্নামে প্রবেশ থেকে রক্ষা করা হয় এবং যারা প্রবেশ করেছে তাদের সেখান থেকে বের করে আনা হয়। অর্থাৎ যারা তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণকারী পাপী মুমিন, তাদের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন।

শায়খ ফাওজান: জান্নাতবাসীরা ততক্ষণ জান্নাতে ঢুকতে পারবে না যতক্ষণ না অনুমতি চাওয়া হবে এবং দরজা খোলা হবে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ.

“আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলার অনুরোধ করব। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করবেন, ‘আপনি কে?’ আমি বলব, ‘মুহাম্মদ’। তখন তিনি বলবেন, ‘আপনার জন্যই আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আপনার আগে যেন কারো জন্য এই দরজা না খুলি’।”[১৯৩]

এটি হবে তাঁর জন্য একটি বিশেষ সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ।

তাঁর বক্তব্য—”তাঁর উম্মত হবে জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম উম্মত”—অন্যান্য উম্মতের ওপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এটি হবে। যেমনটি নবীজি বলেছেন:

وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

“আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।”[১৯৪]

---

[১৯২] **অনুবাদকের নোট:** এর দ্বারা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে, যাদের মর্যাদা নবীদের ঠিক পরেই।

[১৯৩] সহীহ মুসলিম, ১৯৭।

[১৯৪] সহীহ মুসলিম, ৮৫৫।

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্য—"কিয়ামত দিবসে নবীর তিন ধরনের শাফায়াত থাকবে"—শাফায়াত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো মাধ্যম বা অসিলা। প্রচলিত অর্থে এর মানে হলো অন্য কারো কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা। শব্দটি মূলত 'জোড়' করা অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা 'একক' এর বিপরীত। যখন সুপারিশকারী তার নিজের অনুরোধকে সুপারিশ প্রার্থীর অনুরোধের সাথে যুক্ত করেন, তখন তারা দুজনে মিলে একটি জোড়ে পরিণত হন, যা আগে তারা একক হিসেবে ছিলেন।

কিয়ামত দিবসে মোট আট প্রকারের শাফায়াত বা সুপারিশ থাকবে; যার মধ্যে কিছু কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্দিষ্ট, আর অন্যগুলো সাধারণ।

প্রথম শাফায়াত: এটিই হলো সেই 'শাফায়াতে কুবরা' বা 'মাকামে মাহমুদ' (প্রশংসিত স্থান)। হাশরের ময়দানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর বিচার কাজ শুরু করার জন্য নবীজি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। মানুষ প্রথমে অন্যান্য নবীদের কাছে যাবে এবং তারা অপারগতা প্রকাশ করলে শেষে তারা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসবে। অতঃপর তিনি তাঁর রবের অনুমতি নিয়ে সুপারিশ করবেন।

দ্বিতীয় শাফায়াত: বিচার শেষ হওয়ার পর জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য তিনি সুপারিশ করবেন।

তৃতীয় শাফায়াত: নবীজি তাঁর চাচা আবু তালিবের শাস্তি হালকা করার জন্য সুপারিশ করবেন। এই শাফায়াতটি কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট, কারণ আল্লাহ জানিয়েছেন যে কাফিরদের জন্য কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। নবীজি জানিয়েছেন যে শাফায়াত কেবল তাওহিদপন্থীদের জন্য। ফলে তাঁর চাচার জন্য এই সুপারিশটি একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। ওপরের এই তিন প্রকারের সুপারিশ কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যই নির্দিষ্ট।

চতুর্থ শাফায়াত: সেই সব গোনাহগারদের জন্য যারা তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তাদের পাপের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে; তারা যেন জাহান্নামে প্রবেশ না করে সেজন্য এই সুপারিশ।

পঞ্চম শাফায়াত: যারা গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের সেখান থেকে বের করে আনার জন্য এই সুপারিশ।

ষষ্ঠ শাফায়াত: জান্নাতের কোনো কোনো অধিবাসীর মর্যাদা বা স্তর বৃদ্ধির জন্য নবীজি সুপারিশ করবেন।

সপ্তম শাফায়াত: যাদের নেক আমল ও বদ আমল সমান হবে (আরাফবাসী)[১৯৫], তাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন।

অষ্টম শাফায়াত: কোনো কোনো মুমিন ব্যক্তি যেন বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যেতে পারেন, সেজন্য এই সুপারিশ।

শেষের এই পাঁচ প্রকারের সুপারিশে অন্যান্য নবী, ফেরেশতা, সিদ্দিক ও শহীদগণও অংশগ্রহণ করবেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এই শাফায়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং শাফায়াত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে:

১. **প্রথম শর্ত:** সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহর অনুমতি দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ

“কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?”[১৯৬]

এবং তিনি বলেন:

مَا مِنۡ شَفِیۡعٍ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اِذۡنِهٖ ؕ

“তার অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই।”[১৯৭]

২. **দ্বিতীয় শর্ত:** যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার প্রতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ لَا یَشۡفَعُوۡنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارۡتَضٰی

[১৯৫] **অনুবাদকের নোট:** সূরা আল-আরাফ, ৭:৪৬ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে।

[১৯৬] সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৫।

[১৯৭] সূরা ইউনুস, ১০:৩।

"আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"[১৯৮]

এই দুটি শর্তই নিচের আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে:

وَ كَمۡ مِّنۡ مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡـًٔا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ یَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَرۡضٰی ﴿۲۶﴾

"আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহর অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[১৯৯]

শাফায়াতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত: ১. **প্রথম দল:** যারা শাফায়াত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। যেমন খ্রিষ্টান, মুশরিক, চরমপন্থী সুফি ও কবর পূজারীরা। তারা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের সুপারিশকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের কাছে সুপারিশের মতো মনে করে। ফলে তারা আল্লাহর পরিবর্তে সুপারিশকারীর কাছেই প্রার্থনা করে। ২. **দ্বিতীয় দল:** তারা হলো মুতাজিলা ও খারিজি সম্প্রদায়। তারা কবিরা গুনাহগারদের জন্য নবীজির সুপারিশকে অস্বীকার করে। ৩. **তৃতীয় দল:** তারা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। কুরআন ও সুন্নাহর দলিল এবং শর্ত অনুযায়ী তারা শাফায়াতকে সত্য বলে মানে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: আল্লাহ তায়ালা কোনো শাফায়াত ছাড়াই কেবল তাঁর দয়া ও রহমতে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। দুনিয়ার জান্নাতবাসীরা জান্নাতে স্থান করে নেওয়ার পরও সেখানে কিছু জায়গা খালি থাকবে। তখন আল্লাহ একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করবেন এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

শায়খ ফাওজান: শায়খ (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এখানে একটি কারণ উল্লেখ করেছেন যে, কেন তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণকারী পাপিষ্ঠ মুমিনরা কোনো সুপারিশ ছাড়াই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এটি মূলত আল্লাহর রহমত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং দয়ার কারণে ঘটবে। তিনি জাহান্নাম থেকে সেই সব গোনাহগারকে বের করে আনবেন যারা তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে, যার মধ্যে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

[১৯৮] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৮।

[১৯৯] সূরা আন-নাজম, ৫৩:২৬।

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

"নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।"[২০০]

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ.

"অতঃপর মহান আল্লাহ বলবেন, 'ফেরেশতারা সুপারিশ করেছে, নবীরা সুপারিশ করেছেন এবং মুমিনরাও সুপারিশ করেছে; এখন পরম দয়ালু (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ (ক্ষমা করার জন্য) অবশিষ্ট নেই'। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি (এক দল) মানুষকে বের করে আনবেন যারা কখনোই কোনো ভালো কাজ করেনি।"[২০১]

তাঁর (ইবনে তাইমিয়্যাহর) এই বক্তব্য—"দুনিয়ার জান্নাতবাসীরা জান্নাতে স্থান করে নেওয়ার পরও সেখানে কিছু জায়গা খালি থাকবে। তখন আল্লাহ একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করবেন এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"—জান্নাতবাসীরা তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থিতি লাভ করার পরও সেখানে অতিরিক্ত জায়গা থেকে যাবে। এর কারণ হলো আল্লাহ জান্নাতকে অত্যন্ত বিশাল ও প্রশস্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ

"যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের ন্যায়।"[২০২]

সুতরাং, আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের জন্য একটি নতুন জাতি বা মানুষ সৃষ্টি করবেন; কারণ জান্নাত হলো তাঁর রহমত আর তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দান করেন। তবে জাহান্নামের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন; তিনি সেখানে কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

---

[২০০] সূরা আন-নিসা, ৪:৪৮।

[২০১] সহীহ মুসলিম, ১৮৩।

[২০২] সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৩৩।

নবী ﷺ কি জানেন কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে জানতেন কি না।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের সময় জানতেন—এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই। বরং মহান আল্লাহ বলেছেন:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔؕ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ

"তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (বলে) তা কখন ঘটবে? বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই নিকট। শুধু তিনিই যথাসময়ে সেটার প্রকাশ ঘটাবেন; আসমানসমূহ ও যমীনে সেটা ভারী বিষয়।"[২০৩]

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সেই জ্ঞান আসমান ও জমিনের সমস্ত অধিবাসীদের থেকে গোপন রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا

"কিয়ামত তো অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই।"[২০৪]

ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো— "আমি এটি এমনকি নিজের থেকেও গোপন রাখতাম (যদি তা সম্ভব হতো), তবে আমি কীভাবে এটি অন্য কারো কাছে প্রকাশ করব?"[২০৫]

---

[২০৩] সূরা আল-আরাফ, ৭:১৮৭।

[২০৪] সূরা ত্ব-হা, ২০:১৫।

[২০৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে তাবারী।

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “কিয়ামত কখন হবে?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

“এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি কিছু জানেন না।”[২০৬]

এভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে (প্রশ্নকারীকে) জানিয়ে দিলেন যে, এই বিষয়ে উত্তরদাতার জ্ঞান প্রশ্নকারীর জ্ঞানের চেয়ে বেশি নয়। আর সেই প্রশ্নকারী ছিলেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.), যিনি একজন বেদুইনের বেশে এসেছিলেন; কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সাহাবীগণ তা বুঝতে পারেননি। যখন তিনি প্রশ্নটি করেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে কেবল একজন বেদুইন মনে করেছিলেন। সুতরাং, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি নিজের সম্পর্কে এই কথা বলেন যে তিনি একজন (সাধারণ ছদ্মবেশী) বেদুইনের চেয়ে বেশি কিছু জানেন না, তবে অন্য কেউ কীভাবে কিয়ামত কখন হবে সেই জ্ঞান রাখার দাবি করতে পারে?!

কুরআন এবং সুন্নাহ আমাদের কেবল কিয়ামতের আলামত বা লক্ষণসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছে; আর সেই আলামতগুলো সংখ্যায় অনেক। যারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবি করে, তারা মিথ্যাবাদী এবং তারা না জেনেই কথা বলে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

“বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।”[২০৭]

---

[২০৬] বুখারী, ৫০ এবং মুসলিম, ১০।

[২০৭] সূরা আল-আরাফ, ৭:৩৩।

শায়খ ফাওজান: এটি সুবিদিত যে, কিয়ামত কখন হবে তা জানা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। আমাদের জন্য যা আবশ্যক তা হলো কিয়ামতের প্রস্তুতির জন্য নেক আমল করা। মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলকে কিয়ামত কখন হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু তাদের সেই প্রশ্ন ছিল মূলত হঠকারিতা এবং সত্যকে অস্বীকার করার মানসিকতা থেকে। যারা কিয়ামতের সঠিক সময় নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, তারা মূলত একটি অসম্ভব কাজ করার চেষ্টা করছে এবং কেবল সময়ের অপচয় করছে; কারণ এটি গায়েবি বা অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যা কেবল আল্লাহই জানেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি কিয়ামতের সময় না জানেন, তবে তারা কীভাবে তা জানতে পারে? এটি কেবল তাদের অহেতুক কৌতূহল এবং সময়ের অপচয় মাত্র। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

জান্নাতে পানাহার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে ঐসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যারা অস্বীকার করে যে জান্নাতবাসীরা মলমূত্র ত্যাগ ছাড়াই পানাহার করবে। যারা এই বিশ্বাস পোষণ করে তারা কি কাফির হিসেবে গণ্য হবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: জান্নাতে পানাহারের বিষয়টি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ঐকমত্য (ইজমা) দ্বারা প্রমাণিত। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই এবং কোনো মুসলিমের পক্ষে এই বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সম্ভব নয়। একইভাবে, জান্নাতের পাখি এবং প্রাসাদসমূহের বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, যেমনটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতবাসীরা প্রস্রাব, পায়খানা বা থুতু ফেলবে না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস রাখে, তাদের কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। কেবল দুই ধরনের মানুষ এটি অস্বীকার করে—হয় সে কাফির, না হয় মুনাফিক।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে যারা কাফির, তারা জান্নাতবাসীদের জান্নাতে পানাহার এবং বিবাহের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। তারা দাবি করে যে, জান্নাতবাসীরা কেবল গায়িকাদের কণ্ঠস্বর এবং পবিত্র আত্মার সান্নিধ্য উপভোগ করবে; আর এটিই তাদের আত্মায় আনন্দ দেবে। এর পাশাপাশি তারা স্বীকার করে যে দেহ ও আত্মা উভয়ই পুনরুত্থিত হবে এবং শাস্তি বা সুখ ভোগ করবে।

সাবিয়ান (Sabians) এবং দার্শনিকদের মধ্য থেকে যারা কাফির, তারা বিশ্বাস করে যে কেবল আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে। তারা মনে করে শাস্তি বা পুরস্কার কেবল আত্মার ওপরই হবে। অন্যান্য কাফির এবং মুশরিক গোষ্ঠীগুলো পুনরুত্থানকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তারা আত্মা বা দেহ—কোনোটিরই পুনরুত্থান হবে বলে মানে না। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের মুখে স্পষ্ট করেছেন যে, দেহ ও আত্মা উভয়ই পুনরুত্থিত হবে। আর যারা এটি অস্বীকার করে, তিনি তাদের খণ্ডন করেছেন।

কিছু ইহুদি এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিতর্ক করেছিল। তারা বলেছিল, “হে মুহাম্মাদ, আপনি বলেন যে জান্নাতবাসীরা পানাহার করবে। কিন্তু যে পানাহার করে তাকে তো অবশ্যই শৌচাগারে যেতে হয়।” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون، ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس.

“জান্নাতবাসীরা পানাহার করবে, কিন্তু তারা নাক ঝাড়বে না, পায়খানা বা প্রস্রাবও করবে না। সেখানে তাদের খাবার ঢেকুর এবং কস্তুরীর মতো সুগন্ধি ঘামের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর তাসবিহ ও প্রশংসা করবে, যেমনটি স্বাভাবিকভাবে তারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।”[২০৮]

মুসলিম শাসকের উচিত যারা এটি অস্বীকার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

শায়খ ফাওজান: আমাদের বর্তমান যুগে আপনি এমন অনেককে পাবেন যারা সেই সব বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী হয়েছে যাদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছিলেন যে শাসকের উচিত তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। যদি তাদের বুদ্ধি দিয়ে তারা তা বুঝতে না পারে, তবে তারা সহীহ হাদিসসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। কখনো কখনো যদি তারা হাদিসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী সম্পর্কে পরিচিত না থাকে, তবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে—যদিও তিনি সহীহ বুখারী বা মুসলিমের বর্ণনাকারী হন। কখনো কখনো তারা একটি সহীহ হাদিসকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

أنتم أعلم بشئون دنياكم.

“তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়ে অধিক অবগত।”[২০৯]

আল্লাহ তাআলা এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন:

بَلۡ كَذَّبُوۡا بِمَا لَمۡ يُحِيۡطُوۡا بِعِلۡمِهٖ وَ لَمَّا يَاۡتِهِمۡ تَاۡوِيۡلُهٗ ؕ

[২০৮] মুসলিম, ২৮৩৫।

[২০৯] মুসলিম, ২৩৬৩।

“বরং তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তাতে মিথ্যারোপ করেছে, আর যার প্রকৃত পরিণতি এখনো তাদের কাছে আসে নি।”[২১০]

এবং মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿اَكَذَّبۡتُمۡ بِاٰيٰتِىۡ وَ لَمۡ تُحِيۡطُوۡا بِهَا عِلۡمًا اَمَّا ذَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۸۴

“তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তা তোমরা জ্ঞানে আয়ত্ত করতে পারনি? নাকি তোমরা আর কিছু করছিলে?”[২১১]

---

[২১০] সূরা ইউনুস, ১০:৩৯।

[২১১] সূরা আন-নামল, ২৭:৮৪।

পরকালে মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবে?

শায়খ ফাওজান: ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা মানুষের সাথে কোন ভাষায় কথা বলবেন? জান্নাতবাসী এবং জাহান্নামিদের ভাষাই বা কী হবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ: সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সেদিন মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবে তা আমাদের জানা নেই। তাদের প্রতিপালক যখন তাদের সম্বোধন করবেন, তখন তারা কোন ভাষায় তা শুনতে পাবে সে সম্পর্কেও আমরা জানি না; কারণ মহান আল্লাহ আমাদের এ সম্পর্কে কিছু জানাননি এবং তাঁর রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না। জাহান্নামিদের ভাষা 'ফার্সি' (বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট অনারব ভাষা) হবে কিংবা জান্নাতবাসীদের ভাষা 'আরবি' হবে—এমন কোনো কথার সত্যতা প্রমাণিত নয়। এই বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল বলে আমাদের জানা নেই; বরং তাঁরা এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কারণ এটি একটি অহেতুক কৌতূহলী প্রশ্ন মাত্র। পরবর্তীকালের লোকেরা এই বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন যে, সবাইকে আরবি ভাষায় সম্বোধন করা হবে। কেউ বলেন যে, জাহান্নামিরা ফার্সি ভাষায় উত্তর দেবে এবং জাহান্নামে তাদের ভাষাও হবে ফার্সি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের সাথে 'সিরিয়াক' (Syriac) ভাষায় কথা বলা হবে; কারণ এটি ছিল আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ভাষা এবং অন্যান্য সকল ভাষার উৎপত্তি এখান থেকেই। অন্য একদল বলেন যে, কেবল জান্নাতবাসীরাই আরবি ভাষায় কথা বলবে।

এই বক্তব্যগুলোর কোনোটির পক্ষেই বুদ্ধিভিত্তিক বা দলিলভিত্তিক কোনো প্রমাণ নেই; বরং এগুলো প্রমাণহীন দাবি মাত্র। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

মৃত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

শায়খ ফাওজান: এটি হলো গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বিপজ্জনক হাতিয়ার, যার বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগ্রাম করতে হয়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের কী নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী নিষেধ করেছেন—তা যখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত, আদম সন্তানের নেতা, সর্বশেষ নবী ও রাসূল, প্রথম ও শেষ প্রজন্মের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব, যাঁর সুপারিশের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি এবং আল্লাহর কাছে যাঁর সম্মান সবচেয়ে মহান, সেই নবীজির হকের (অধিকারের) প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে; তখন এটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাঁর চেয়ে নিম্নমর্যাদার যে কেউ—তিনি নবী হোন বা কোনো নেককার ব্যক্তি—তাদের প্রতি ইবাদতের কোনো অংশ নিবেদন করা বৈধ নয়। কারো কবরকে উপাস্য মূর্তিতে পরিণত করা জায়েজ নয়। আল্লাহ ছাড়া জীবিত বা মৃত কারো কাছেই দোয়া করা বৈধ নয়। কোনো ব্যক্তির জন্য তার শায়খ বা পীরের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েজ নয় যদি সেই ব্যক্তি অনুপস্থিত বা মৃত হন। এই ধরনের অবৈধ কথার উদাহরণ হলো— "হে অমুক পীর/মালিক, বৃষ্টি দিন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে রক্ষা করুন!" এসবই হলো শিরক বা অংশীবাদ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন। এই বিষয়টির অবৈধতা প্রত্যেক মুসলিমের জানা ও বোঝা আবশ্যক।

যেসব ব্যক্তি অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তিদের কাছে তাদের কবরে বা অন্য জায়গায় সাহায্য চায়, শয়তান তাদের ঠিক সেভাবেই বিভ্রান্ত ও ধোঁকা দেয় যেভাবে সে মূর্তিপূজারীদের দিত; কারণ এটিও এক প্রকার মূর্তিপূজা।

শয়তান সেই মৃত ব্যক্তিদের রূপ ধারণ করে যাদের কাছে তারা দোয়া করছে। শয়তান তাদের সাথে কথা বলে এবং গণকদের মতো তাদের কাছে কিছু বিষয় প্রকাশ করে। তার কিছু কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাতে মিথ্যা থাকবে; বরং সত্যের চেয়ে মিথ্যার প্রাধান্যই বেশি থাকবে। শয়তান হয়তো তাদের কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেয় বা তাদের অপছন্দনীয় কিছু থেকে রক্ষা করে। তখন ওই ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার পীর বা শায়খ শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে এই কাজগুলো করছেন। অথবা সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ কোনো ফেরেশতাকে তার শায়খের রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ বলে, "এটি শায়খের কারামত বা গোপন রহস্য।" কিন্তু আসলে এটি কেবল শয়তান, যে তাদের বিভ্রান্ত

করার জন্য সেই রূপ ধারণ করেছে। একইভাবে শয়তান মূর্তির ভেতরে প্রবেশ করে পূজারীদের সাথে কথা বলে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। আরবের মুশরিকদের মূর্তিতেও শয়তান প্রবেশ করত এবং আজও তুর্কি, ভারতীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিকদের মাঝে এটি বিদ্যমান। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও এটি ঘটে যখন তারা তাদের যাজকদের কাছে সাহায্য চায়। শয়তান তখন সেই খ্রিষ্টান যাজকদের রূপ ধরে তাদের কিছু কাজ করে দেয়।

এই ব্যক্তিরা নবী, নেককার মানুষ, শায়খ এবং আহলে বাইতসহ মৃতদের কাছে সাহায্য চায়। তাদের লক্ষ্য থাকে অভাব পূরণ বা কোনো গোপন খবর জানা। তারা এই কাজটিকে তাদের জন্য দেওয়া একটি 'কারামত' বা অলৌকিক ঘটনা মনে করে।

তাদের কেউ কেউ তাদের ইবাদতকৃত বা সাহায্য চাওয়া পীরের কবরে যায় এবং তারা খাদ্য, অর্থ বা অস্ত্রসহ অন্যান্য চাহিদাকৃত জিনিস নিয়ে আকাশ থেকে উড়ে আসে। ওই ব্যক্তি মনে করে এটি তার পীরের কারামত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো কেবলই শয়তান। মানুষের মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়ার এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

ইব্রাহিম খলিল (আ.) বলেছিলেন:

وَّ اجۡنُبۡنِیۡ وَ بَنِیَّ اَنۡ نَّعۡبُدَ الۡاَصۡنَامَ ﴿ؕ۳۵﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضۡلَلۡنَ کَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ

"হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করুন(২) এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। হে আমার রব! এ সব মূর্তি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।"[২১২]

এটি সর্বজনবিদিত যে, মূর্তিরা নিজেরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করেনি, বরং মানুষের নিজস্ব বিভ্রান্তিই এর কারণ। কোনো মূর্তিপূজারীই বিশ্বাস করে না যে তাদের মূর্তি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে; বরং তারা বিভিন্ন কারণে তাদের মূর্তিকে সুপারিশকারী বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর অন্যতম কারণ হলো তারা নবী ও নেককার মানুষদের প্রতিকৃতি বা মূর্তি বানিয়েছিল। কেউ কেউ নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রের জন্য মূর্তি ও তিলিসমাতি (তাবিজ) তৈরি করেছিল। অন্যরা জিনের জন্য এটি করেছিল। কারো কারো ইবাদতের উদ্দেশ্য ছিল ফেরেশতা, নবী বা নেককার মানুষ; কিন্তু বাস্তবে তারা শয়তানের ইবাদত করছিল। মানুষ ফেরেশতা ও

---

[২১২] সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৫-৩৬।

নেককারদের ইবাদতের নিয়ত করলেও কিয়ামতের দিন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা কখনোই মানুষকে তাদের ইবাদত করতে বলেনি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ يَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ يَقُوۡلُ لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِيَّاكُمۡ كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَ ﴿۴۰﴾ قَالُوۡا سُبۡحٰنَكَ اَنۡتَ وَلِيُّنَا مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ بَلۡ كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَ الۡجِنَّ ۚ اَكۡثَرُهُمۡ بِهِمۡ مُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۴۱﴾

"আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো ইবাদাত করত জিনদের। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত।"[২১৩]

অনেক ইবাদতকারী শয়তানের ইবাদত করাকে বৈধ মনে করে না; কিন্তু তারা এই ধোঁকায় পড়ে যে তারা কোনো নবী, নেককার ব্যক্তি বা ফেরেশতার কাছে প্রার্থনা করছে। আবার কেউ কেউ জিনের ইবাদত করাকে ঠিক মনে করে এবং তারা জেনেশুনেই তা করে। মানুষের রূপ ধরা শয়তান হয়তো ওই ব্যক্তিকে তাকে সেজদা করতে বা তার সাথে কোনো অশ্লীল কাজ করতে বলতে পারে। শয়তান তাকে মৃত পশুর মাংস খেতে, মদ পান করতে বা তাদের নামে পশু কোরবানি করতে বলতে পারে।

অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন নয়; বরং তারা মনে করে তারা ফেরেশতাদের সাথে অথবা 'রিজালুল গায়েব' বা অদৃশ্য মানুষদের সাথে কথা বলছে। তারা বিশ্বাস করে এই অদৃশ্য মানুষেরা আল্লাহর ওলি যারা মানুষের চোখের আড়ালে থাকে। কিন্তু এগুলো আসলে মানুষ রূপী জিন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الۡاِنۡسِ يَعُوۡذُوۡنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الۡجِنِّ فَزَادُوۡهُمۡ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾

"এও যে, কিছু কিছু মানুষ কিছু জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।"[২১৪]

যখন কোনো ব্যক্তি রাত কাটানোর জন্য কোনো উপত্যকায় নামত, তখন সে সেই উপত্যকার জিনদের ভয় পেত। তাই সে বলত, "আমি এই উপত্যকার নির্বোধদের অনিষ্ট থেকে এর

[২১৩] সূরা সাবা, ৩৪:৪০-৪১।

[২১৪] সূরা আল-জিন, ৭২:৬।

নেতার (জিনের) আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” এভাবে মানুষ জিনের আশ্রয় নিত, যা জিনদের অহংকার ও সীমালঙ্ঘন বাড়িয়ে দিত। জিনরা বলত, “মানুষ আমাদের কাছে আশ্রয় চাইছে!” একইভাবে তাদের ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রের মধ্যে পুরুষ জিনদের নাম থাকত যাদের কাছে তারা সাহায্য চাইত। তারা শয়তানদের সম্মান করত এবং বিনিময়ে শয়তানরা তাদের কিছু কাজে সাহায্য করত। এটি হলো জাদু এবং শিরকের একটি রূপ। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ اتَّبَعُوۡا مَا تَتۡلُوا الشَّیٰطِیۡنُ عَلٰی مُلۡكِ سُلَیۡمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَیۡمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ كَفَرُوۡا یُعَلِّمُوۡنَ النَّاسَ السِّحۡرَ * وَ مَاۤ اُنۡزِلَ عَلَی الۡمَلَكَیۡنِ بِبَابِلَ هَارُوۡتَ وَ مَارُوۡتَ ؕ وَ مَا یُعَلِّمٰنِ مِنۡ اَحَدٍ حَتّٰی یَقُوۡلَاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَۃٌ فَلَا تَكۡفُرۡ ؕ فَیَتَعَلَّمُوۡنَ مِنۡهُمَا مَا یُفَرِّقُوۡنَ بِهٖ بَیۡنَ الۡمَرۡءِ وَ زَوۡجِهٖ ؕ وَ مَا هُمۡ بِضَآرِّیۡنَ بِهٖ مِنۡ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ یَتَعَلَّمُوۡنَ مَا یَضُرُّهُمۡ وَ لَا یَنۡفَعُهُمۡ ؕ وَ لَقَدۡ عَلِمُوۡا لَمَنِ اشۡتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنۡ خَلَاقٍ ۟ؕ وَ لَبِئۡسَ مَا شَرَوۡا بِهٖۤ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ لَوۡ كَانُوۡا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

“আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, ‘আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরী করো না’। তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত!”[২১৫]

তাদের মধ্যে অনেকেই আকাশে ওড়ে, আসলে শয়তানই তাদের বহন করে নিয়ে যায়। শয়তান তাদের মক্কা বা অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। মক্কায় যাওয়া সত্ত্বেও সে একজন ধর্মত্যাগী হতে পারে যে নামাজ বা অন্যান্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করে। শয়তান কেবল তার কুফরি, সীমালঙ্ঘন এবং পাপের কারণেই তার সঙ্গী হয়।

---

[২১৫] সূরা আল-বাকারাহ, ২:১০২।

সমাপ্ত